চন্দ্রকণা



৺চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্-প্রণীত

গ্রন্থাবলী হইতে আদর্শ রচনা চয়ন।

তৃতীয় সংস্করণ।



প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত,
ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী,
৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[মূল্য ১।৹ পাঁচসিকা মাত্র।

Chandrakona is approved by the Director of Public Instruction for the Upper Classes of High Schools in West Bengal, for Class VIII of High Schools in East Bengal, for class VII of Vernacular Schools in East Bengal (Vide Calcutta Gazette date 6-11-18) and for Prize and Library in Schools of East and West Bengal (Vide Calcutta Gazette, dated 27-11-18); it has also been recommended by the Calcutta University as a text-book for Matriculation Examination, 1921 (Vide Calcutta Gazette dated 9-10-18).

ভূমিকা।

পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺চন্দ্রনাথ বসু এম্‌-এ, বি-এল্‌ মহোদয়-বিরচিত গ্রন্থাবলী হইতে কণা কণা আহরণপূর্ব্বক এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত গঠিত। তাই ইহার নাম—চন্দ্রকণা। ইহার বিশেষত্ব ও উপযোগিতা নির্দ্দেশের পূর্ব্বে মূল গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক।

সাহিত্যালোচনার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ চারিটি :—(১) ভাষাশিক্ষা, (২) চরিত্রগঠন, (৩) বিশুদ্ধ ভাব ও প্রকৃত সৌন্দর্য্যবোধের বিকাশ-সাধন, (৪) বিচারক্ষমতার উদ্বোধন। এখন দেখিতে হইবে চন্দ্রনাথ-বাবুর রচনা পাঠে উল্লিখিত উদ্দেশ্যচতুষ্টয় কি পরিমাণে সিদ্ধ হয়।

১। ভাষা-শিক্ষা।

ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে সরল এবং অলঙ্কারবহুল উভয়বিধ রচনার সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। চন্দ্রনাথবাবুর লেখার বিশেষত্ব এই যে তিনি একদিকে যেমন সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য সহজ ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও লালিত্য-পূর্ণ পদাবলী প্রয়োগে বঙ্গভাষার অপূর্ব্ব সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার সরল রচনার নিদর্শন তৎপ্রণীত "পৃথিবীর সুখ দুঃখ," "সংযম-শিক্ষা" প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে তাঁহার 'শকুন্তলা-তত্ত্ব,' 'ত্রিধারা,' 'ফুল ও ফল' ইত্যাদি পুস্তক শব্দসম্পদের এবং গুরুগম্ভীর রচনার অতুলনীয় ভাণ্ডার। তাঁহার লেখা স্থানীয় বিশেষত্ববর্জ্জিত। তিনি অপ্রচলিত ও অপভ্রংশ শব্দের প্রয়োগ প্রায় কোথাও করেন নাই। ইংরাজী ভাষায় প্রগাঢ় পারদর্শী হইয়াও তিনি বিলাতী বাঙ্গালা কখন

লিখিতেন না এবং ঐরূপ লেখা অতিশয় দোষাবহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি "বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি" নামক বঙ্গ-ভাষাসংক্রান্ত বহু গবেষণাপূর্ণ যে পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া খ্যাতনামা প্রাচ্যভাষাভিজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিত অধ্যাপক ব্লুমহার্ট বলিয়াছিলেন :—

"Your valuable paper shoud be studied by every would be author. If Bengalis and specially English speaking Bengalis, would make a point of writing in the language of their own couutry and for the good of their own county, many of the blemishes you so justly condemn would disappear.

২। চরিত্র গঠন।

নীতিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু নৈতিক উপদেশ কি ভাবে দিলে উহা কার্য্যকরী হয় তাহা নির্দ্ধারণ করা বড় কঠিন। অহিংসা, পরোপকার প্রভৃতি সৎবৃত্তি-সমূহের উপাদেয়তা কাহারো অবিদিত না থাকিলেও জীবনে ঐগুলির প্রতিষ্ঠা যে প্রায়ই হয় না তাহা সকলেই জানেন। এ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার "প্রথম নীতি পুস্তক" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :—"সূত্রের আকারে বা সাধারণ ভাবে উপদেশ দিলে নীতিশিক্ষা সহজে হইতে পারে না। কারণ, ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে বা অবস্থাবিশেষে নীতিসূত্রের কি প্রকার প্রয়োগ আবশ্যক তাহা নির্ণয় করিবার ক্ষমতা সকলের নাই। কিন্তু নীতিসূত্রের এই প্রকার প্রয়োগ করিতে না পারিলে নীতিশিক্ষা কেবল যে ব্যর্থ হয় তাহা নহে, মনুষ্যকে অত্যাবশ্যক দৈনন্দিন কর্ত্তব্য ছাড়িয়া বড় বড় লক্ষ্যহীন ভাবের পক্ষপাতী করিয়া বিশেষ অপকারও করে। অতএব সাধারণ ভাবে নীতিশিক্ষা না দিয়া পারিবারিক ও সামাজিক প্রণালীর প্রকৃতি বিবেচনা

করিয়া কাহার প্রতি কি কর্ত্তব্য পালন করা আবশ্যক এই ভাবে নীতিশিক্ষা দেওয়া বেশী ফলদায়ক মনে করি।" তাঁহার "ত্রিধারা" নামক পুস্তকেও তিনি বলিয়াছেন :—"শুধু উপদেশবাক্যে বা উচ্চ ভাবের জোরে সমাজকে বাঁধিয়া রাখা যায় না। সমাজকে বাঁধিতে ও সদাচার-সম্পন্ন করিতে হইলে, মুখের উপদেশ চাই, পারিবারিক শাসন প্রভৃতিও চাই। মানুষকে যেমন উপদেশ দিয়া এবং উচ্চ ভাবের তরঙ্গের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ভাল করিবার চেষ্টা করা চাই, আচার ব্যবহার, সামাজিক প্রথা ও অনুষ্ঠানাদির দ্বারাও তেমনি ভাল করিবার চেষ্টা করা চাই।" ফলতঃ যে দেশে, যে কালে, যে গৃহে, যে সমাজে থাকিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে সেই দেশ, কাল, গৃহ ও সমাজের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে ব্যবস্থা নিষ্ফল হইবারই কথা। চন্দ্রনাথবাবুর নীতিবিষয়ক গ্রন্থাবলীর বিশেষত্ব এই যে, ঐ সমস্ত পুস্তকে বাঙ্গালীর দেহ মন, শক্তি সামর্থ্য, আশা আকাঙ্ক্ষা, গৃহ সমাজ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণ ও প্রগাঢ় গবেষণা পরিদৃষ্ট হয়। তিনি সকল দিকে সমান লক্ষ্য রাখিয়া গৃহ ও সমাজে যাহাতে পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা ও পরিবর্দ্ধন হয়—প্রতি সংসার যাহাতে সুপিতা, সুমাতা, সুপুত্র, সুকন্যা প্রভৃতির সুখময় আশ্রয়স্থল হয়—প্রত্যেক বাঙ্গালী যাহাতে দোষ বর্জ্জনপূর্ব্বক গুণার্জ্জন দ্বারা চরিত্রবান্, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া আপনাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে গৌরবান্বিত বোধ করে—তাহারই সরল, সহজ ও কার্য্যকরী পন্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই শ্রেণীর রচনা পাঠে আমাদের দেশের শীর্ষস্থানীয় মনস্বিগণ যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে কয়েকখানির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ক। Professor Shama Charan Ganguli, B. A. late Principal, Utterpara College :—

"I have read your *Pratham Niti Pustak* with great interest and I can have no hesitation in saying that the book will be of great benefit to boys and girls in Bengal. The book aims at teaching them how to conduct themselves in the midst of their peculiar domestic and social surroundings. This, I think, is just as it should be."

খ। বঙ্গের সুবিখ্যাত সাহিত্যরথী ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :—

"কঃ পন্থাঃ" পড়াইয়া তুমি আমার চক্ষু খুলিয়া দিয়াছ। কঃ পন্থাতে কবিত্বের যে তরঙ্গ তুলিয়াছ—প্রগাঢ় দৃষ্টির যে পরিচয় দিয়াছ—গূঢ় ব্যঙ্গ-শক্তির যে ইঙ্গিত দেখাইয়াছ, আর পূর্ব্বপুরুষের প্রতি যে ভক্তির প্রমাণ দিয়াছ—সত্য সত্যই তাহা হৃদয়হারক। পড়িতে পড়িতে আহ্লাদ হইয়াছে, উৎসাহ হইয়াছে—আবার, স্বীকার করিয়াই ফেলি, রচনাভঙ্গী দেখিয়া, সমালোচনার নৈপুণ্য দেখিয়া আমার ঈর্ষাও হইয়াছে। জন্মগুণে আমি তোমার জ্যেষ্ঠ, আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হইয়া কঃ পন্থাঃ—এই প্রশ্নের উত্তর দুর্ভাগ্য সামাজিকগণের দীন অন্তঃকরণে পুরিয়া দিয়া স্বজাতিকে সম্পন্ন করিতে থাক। লেখাতে অমৃত বর্ষণ করিয়াছ—লোকে পড়িতে শিখুক—পড়িলে অমর হইবে।"

গ। **The Hon'ble Rai P. N. Mukherjee Bahadur, M. A.** I.S. O. Inspector-General of Registration, Bengal :—

"I read it (*Sanjam Siskha*) and my father and nearly every one in my house read and re-read it with pleasure and profit. I am sure you speak from the heart and it goes straight to the heart. There is a lot of practical wisdom compressed within those few pages and my young countrymen would do well to take your wholesome advise to heart."

৩। চিত্তশুদ্ধি ও সৌন্দর্য্য ধারণা।

স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে সৌন্দর্য্য দ্বিবিধ। যাহা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা স্থূল, যাহা অন্তরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা সূক্ষ্ম। বহির্জগৎ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য—

অন্তর্জগৎ অন্তরিন্দ্রিয় বা মনোগ্রাহ্য। কিন্তু কি বহির্জগৎ কি অন্তর্জগৎ কোন জগতেরই প্রকৃত শোভা ভাব ব্যতীত অনুভূতিবেদ্য নহে। "ফুল ও ফল" নামক পুস্তকে চন্দ্রনাথবাবু বলিয়াছেন ঃ—"যাহা কিছু সুন্দর তাহা কেবল ভাবের গুণেই সুন্দর। সৌন্দর্য্য চক্ষে দেখা যায় না, কেবল ভাবের ঘোরে দেখিতে পাওয়া যায়। সৌন্দর্য্য আকারে নাই, গঠনে নাই, বর্ণে নাই—সৌন্দর্য্য ভাবে।" আবার অশুদ্ধ ভোগাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিতে না পারিলে ভাব, সৌন্দর্য্য উপলব্ধির সহায়ক হয় না। এই মহাসত্যটি চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার রচনার বহু স্থলে বিবৃত করিয়াছেন। "পৃথিবীর সুখ দুঃখ" নামক পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন ঃ— "আবিল পৃথিবীকে চিরকাল নির্ম্মল স্বর্গরূপে অনুভব করিতে হইলে চিরকাল ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে হয়। সমস্ত জীবন অসীম আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে সমস্ত জীবন ব্রহ্মচারী থাকিতে হয়।" ব্রহ্মচারী কাহাকে বলে, ব্রহ্মচর্য্য কি, ব্রহ্মচারীর দৃষ্টিতে জগদ্দর্শনই বা কি— এসকল বিষয় তিনি হিন্দুত্ব নামক পুস্তকে বুঝাইয়াছেন! ফল কথা, সৌন্দর্য্যধারণা চিত্তশুদ্ধিসাপেক্ষ ; অর্থাৎ পবিত্র ভাবের স্ফুরণ না হইলে যথার্থ সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎকার অসম্ভব।

চন্দ্রনাথবাবু বিশুদ্ধ মনে ও বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক সুষমা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তাই আমরা তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে একদিকে যেমন বাহ্যজগতের বিমল ও নিখুঁত বর্ণনা লিপিবদ্ধ দেখি, অপরদিকে তেমনি মনোরাজ্যেরও মোহন ও মহনীয় চিত্র প্রাপ্ত হই। আবার তাঁহার অধিকাংশ রচনাই—দয়া দাক্ষিণ্য, শৌর্য্য সহিষ্ণুতা, ভক্তি ভালবাসা, একাগ্রতা তন্ময়তা প্রভৃতি গুণের আধারস্বরূপ—আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ রমণীর বিবরণীতে পরিপূর্ণ। অধিকন্তু তাঁহার "ফুল ও ফল" ও "ত্রিধারায়" তিনি গভীর দার্শনিক প্রণালীতে ভাববিকাশ ও সৌন্দর্য্য-

তত্ত্বসংক্রান্ত যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার তুলনা মিলে কি না সন্দেহ। তাঁহার "ত্রিধারা" পড়িয়া জ্ঞানবৃদ্ধ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে, টি, এম, এ, ডি, এল, পি, এচ, ডি মহোদয় বলিয়াছেন ঃ—

"আপনার প্রণয়প্রদত্ত "ত্রিধারা" নামক পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি ও যত্নের সহিত পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। এই ত্রিধারার গভীর পবিত্র স্নিগ্ধ চিন্তাস্রোতে অবগাহন করিলে মনের মালিন্য দূর হয়, চিত্তচাঞ্চল্য প্রশমিত হয়। যে গভীর ভক্তি ও অনন্ত ভাবপূর্ণ অন্তঃকরণ এই ত্রিধারার স্রোতের উৎস, আশীর্ব্বাদ করি যেন সে অন্তঃকরণ চিরসুখী হয়।"

৪। বিচারশক্তির উদ্বোধন।

সত্য নির্ণয়ার্থ যে প্রণালী অবলম্বনীয় তাহার নাম বিচার। ভূয়োদর্শনে বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যুপস্থাপিত তত্ত্বের ন্যায়শাস্ত্রসম্মত সমীকরণ, বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিচারের অঙ্গ। বিচার ব্যতীত সত্য নিষ্কাশন হয় না। যাহা সত্য নহে তাহা স্বীকার্য্যও নহে। নীতি বল, ধর্ম্ম বল, সৌন্দর্য্য বল—সকলই অগ্রাহ্য যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়। সুতরাং সত্যই সুন্দর, সত্যই নীতি, সত্যই ধর্ম্ম। এমন যে সত্য ইহার মূলে বিচার, ইহা বিচারলভ্য। ফলতঃ বিচারপ্রবণতাই মানবের ইতরপ্রাণী হইতে ব্যাবর্ত্তক লক্ষণ এবং উহার স্ফুরণের তারতম্যানুসারে মনুষ্যত্বেরও তারতম্য ঘটে। অতএব বিচারবহুল রচনার অসীম গৌরব; কারণ তাদৃশ রচনার চর্চ্চা বিচারশক্তি বিকাশের একটী প্রধান সহায়।

এইবার চন্দ্রনাথবাবুর লেখা কি পরিমাণে যুক্তিপূর্ণ তাহা দেখিতে হইবে। এ সম্বন্ধে তাঁহার "হিন্দুত্ব" নামক পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে

প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র অমৃতবাজার পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহারই কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"The discussions are carried throughout the book in strictly logical method and the author has made no attempt to hide confussion of thought by verbosity and rhetoric. The Adaitabad doctrine which European metaphysicians have, by mistake, natural to them, called panthiestic doctrine and which has in fact been distantly echoed by thinkers like Spinoza has been elucidated and supported in a manner that would do credit to any European theologist or metaphysician."

আবার চন্দ্রনাথবাবুই আমাদের দেশে সমালোচনাসাহিত্যের প্রবর্ত্তক এবং ঐ ক্ষেত্রে আজি পর্য্যন্ত তাঁহার সমকক্ষ অপর কেহ আবির্ভূত হন নাই। সমালোচনা কার্য্যটী যে পূর্ণমাত্রায় যুক্তি-তর্ক-সাপেক্ষ তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার 'শকুন্তলাতত্ত্ব' 'সাবিত্রীতত্ত্ব' প্রভৃতি বঙ্গভাষায় আদর্শ সমালোচনা গ্রন্থ। মৃত মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস, সি, আই, ই বলিয়াছিলেন :—

"*Sakuntala Tattwa and Sabitri Tattwa* will be considered as classics in our language by generations of our countrymen."

অতঃপর এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে ভাষা শিক্ষাদি যে চারিটি লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাহিত্য চর্চ্চা করা হইয়া থাকে, তাহার সকলগুলিই চন্দ্রনাথবাবুর রচনা পাঠে সুসিদ্ধ হয়। তাঁহার লেখার চিরস্থায়ী গৌরব ও আকর্ষণ সম্বন্ধে বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী পণ্ডিতাগ্রণী হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কে, টী, সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, এম, এ, ডি, এল, সি, এস, আই ; ডি, এস, সি, এফ, আর, এ, এস, এফ, আর, এস, ই, মহোদয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন উপলক্ষে বক্তৃতা কালে বলিয়াছিলেন :—

"By the death of Babu Chandra Nath Basu we have lost one of a small band of brilliant graduates, whose career in life has spread the reputation of this university far and

wide. His contributions to the literature of Bengal are of abiding and perennial interest, and they will serve to hand his name down to posterity as that of one of the brightest products of English education in this country."

'চন্দ্রকণা'র বিশেষত্ব ও উপযোগিতা।

বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সিন্ধু; সিন্ধুতে যাহা আছে বিন্দুতে তাহার কিছু না কিছু থাকিবেই। চন্দ্রকণাও চন্দ্রনাথবাবুর রচনারাশি হইতে বিন্দু সংগ্রহে সঞ্জাত; সুতরাং তৎপ্রণীত মূল গ্রন্থাবলীচর্চ্চার মহৎ ফল যে চন্দ্রকণা পাঠেও কিয়ৎ পরিমাণে অধিগত হইবে তাহা সুনিশ্চিত।

এই পুস্তক প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য, অল্পের মধ্যে পাঠকবর্গকে চন্দ্রনাথবাবুর অমৃতময়ী রচনার কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান। তাঁহার লেখা—দার্শনিকতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের বিবৃতিতে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে এই পুস্তকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী চারিশ্রেণীর প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল, যথা:—(১)—বর্ণনামূলক (Descriptive), (২) সুনীতি ও সদাচার বিষয়ক (Reflective), (৩) আখ্যায়িকাত্মক (Narrative), (৪) যুক্তিপ্রধান (Argumentative)। অধিকন্তু সকলে যাহাতে একাধারে তাঁহার সরল এবং অলঙ্কারবহুল উভয় প্রকার রচনার রসাস্বাদনে সক্ষম হইতে পারেন তন্নিমিত্ত ইহাতে তৎপ্রণীত প্রায় সমস্ত গ্রন্থ হইতেই কিছু না কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে ইহাতে চন্দ্রনাথবাবুর—মনস্তত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, দার্শনিকতত্ত্ব প্রভৃতি দুরূহ ও জটিল বিষয়সংক্রান্ত কোন প্রবন্ধই আহৃত হয় নাই। গ্রন্থান্তরে তাঁহার ঐরূপ লেখা আহরণপূর্ব্বক প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প আছে।

এই প্রসঙ্গে একটী কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রনাথবাবুর

স্বরচিত সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী এবং তাঁহার 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধ তৎপ্রণীত কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। ঐ দুইটী এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইল।

পূজ্যপাদ পিতৃদেবের বন্ধু এবং আমাদের অশেষ ভক্তিভাজন অনারেবল রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, এম্-এ, আই এস্, ও, মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই ভূমিকাটি দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সঙ্কলনের সৌকর্য্যার্থ সংগৃহীত প্রবন্ধ-সমূহের দুই এক স্থলে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে।

৫নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
২০শে জৈষ্ঠ, সন ১৩২৫ সাল।

শ্রীহরনাথ বসু,
শ্রীপ্রকাশনাথ বসু।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বিদ্যালয়সমূহের শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যক্ষ মহোদয়গণ, ছাত্রদিগের পক্ষে 'চন্দ্রকণা'র উপযোগিতা সম্বন্ধে, অনুগ্রহপূর্ব্বক যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা গ্রন্থশেষে মুদ্রিত হইল। আমাদের এই সাহিত্যপ্রচার-সংক্রান্ত উদ্যমে ঐকান্তিক সহানুভূতি ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

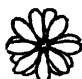
কলিকাতা
১৭ই পৌষ, সন ১৩২৫ সাল।

শ্রীহরনাথ বসু,
শ্রীপ্রকাশনাথ বসু।

বন্দনা



তব পুণ্য তপোবনে, তুলি ফুল সযতনে,
করিবারে তোমারে অর্চ্চনা।
তোমারি মধুর-ছন্দে, তোমারি পদারবিন্দে,
চিত্ত চাহে করিতে বন্দনা॥



স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় প্রণীত যে পুস্তক হইতে যে প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার তালিকা :—

মূল গ্রন্থের নাম			উদ্ধৃত প্রবন্ধের নাম
পৃথিবীর সুখ দুঃখ	...	...	পল্লীবাসের সুখ।
ঐ	...	...	পূজার আনন্দ।
ফুল ও ফল	...	...	শীত ও বসন্ত।
ঐ	...	...	ফুল ও নক্ষত্র।
ত্রিধারা	..	...	পাখী।
ঐ	...	...	চিত্রচয়ন।
ঐ	...	...	ধৈর্য্য ও ক্ষিপ্রকারিতা।
প্রথম নীতি পুস্তক	...	...	জ্ঞাতি ও কুটুম্ব।
ঐ	...	...	স্বগ্রামবাসী।
ঐ	...	...	সর্ব্বসাধারণের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য।
হিন্দুত্ব	...	...	ব্রহ্মচর্য্য (ছাত্রের কর্ত্তব্য)।
ঐ	...	...	ধ্রুব (দৃঢ় প্রতিজ্ঞা)।
ঐ	...	...	ঔশীনর (আশ্রিত রক্ষা)।
শকুন্তলাতত্ত্ব	...	...	দুর্ব্বাসার শাপ।
ঐ	...	...	শকুন্তলার পতিগৃহে গমন।
ঐ	...	...	দুষ্মন্ত (কর্ত্তব্যনিষ্ঠা)।
ঐ	...	...	মহর্ষি কণ্ব (মহানুভবতা)।

মূল গ্রন্থের নাম	উদ্ধৃত প্রবন্ধের নাম।
সাবিত্রী-তত্ত্ব	সাবিত্রী (আদর্শ নারী)।
বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি ...	সাহিত্যের লক্ষ্য।
কঃ পন্থাঃ	ভোগাসক্তি।
বেতালে বহু রহস্য	কারণরহস্য।
	চন্দ্রনাথ বসু। [চন্দ্রনাথ বাবুর স্বরচিত সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী ; 'বঙ্গভাষার লেখকগণ' নামক পুস্তকে প্রকাশিত।]
	বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র। ['প্রদীপ' নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত।]

সূচীপত্র

প্রবন্ধের নাম।	পত্রাঙ্ক।

প্রথম অধ্যায়—বর্ণনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়—সুনীতি ও সদাচার।

তৃতীয় অধ্যায়—আখ্যায়িকা ও জীবনী।

ক। আখ্যায়িকা।

খ। জীবনী।

চতুর্থ অধ্যায়—যুক্তিপ্রধান রচনা।

চন্দ্রকলা

প্রথম অধ্যায়।



বর্ণনা



পল্লীবাসের সুখ।

তখন আমার বয়স আট দশ বৎসরেব বেশী নয়। আমি পাঠশালায় পড়ি, আমার স্বভাব কিছু চঞ্চল, কিন্তু আমি দুষ্ট বা দুরন্ত নই। আমার চঞ্চলতা দেখিয়া আমাদের এক বয়স্ক কুটুম্ব আহ্লাদ করিয়া আমাকে বিচ্চু বলিয়া ডাকিতেন। তাহাতে আমি ভারী খুসী। তখন আমার চক্ষু আর একরকম ছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু একথা বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না যে, তখন যাহাই দেখিতাম—রৌদ্র, জ্যোৎস্না, গাছপালার রঙ্, মাটী, মাঠ, ঘাস—যাহাই দেখিতাম, তাহাই যেন এখন হইতে ভিন্ন রকম দেখিতাম—

বড় মধুর, বড় মিঠা, বড় বিশুদ্ধ, বড় সরল, বড় নির্দ্দোষ, বড় পবিত্র, বড় সজীব। কিছুতেই মনে অপবিত্র বা আবিল ভাব উঠাইয়া দিত না, সকলই আমার মনে একটা কোমল, কলুষহীন আনন্দের ভাব তুলিয়া দিত। সে আনন্দের বর্ণনা হয় না, যে অনুভব করিয়াছে, সেই বুঝিতে পারে, সে কি অপূর্ব্ব, কি অনিন্দ্য জিনিস—কত নির্ম্মল, কত শীতল, কত সাদাসিদে। সেই আনন্দে ভাসিতে ভাসিতে কত বেলা অবধি মাঠে মাঠে বেড়াইতাম, দূরে চাষার গান শুনিতাম, আশে পাশে গরুর হাম্বারব শুনিতাম।

নোনাপোতা, মনসাপোতা, ধনপোতা—চারিদিকে ধানক্ষেত, মাঝখানে খানিকটা করিয়া উচ্চজমি—তাহাতে চাষ হইত না, গরু চরিত, আর আমরা খেলা করিতাম। নোনাপোতা আমাদের বাড়ীর অতি নিকটে, ঘরে শুইয়া বসিয়া দেখিতাম। সেখানে বড় বড় অশ্বত্থ গাছ আছে, নোনা গাছ কখনও দেখি নাই। মধ্যে মধ্যে শুক্‌না পাতা ঘুরিতে ঘুরিতে উড়িত, আর রাত হইলে আপনা-আপনি জ্বলিয়া উঠিত। তাই প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধারা বলিতেন," নোনাপোতায় ভূত প্রেত আছে। আমরাও নোনাপোতার নামে একটু কাঁপিয়া উঠিতাম। যে নোনাপোতায় ভূত প্রেতের বাস, সেই নোনাপোতায় 'বল্‌দেরা' তাঁবু ফেলিয়া দুই একদিন করিয়া বাস করিত। যতক্ষণ তাহারা থাকিত, ততক্ষণ আমরা নোনা-পোতাকে ভয় করিতাম না। প্রত্যুষে উঠিয়া গিয়া তাহাদের তাঁবুর ভিতর বসিয়া থাকিতাম। দেখিতাম, এক যা:গার ধান চা'ল



আর এক যায়গায় যাইতেছে; বুঝিতাম না কেন যায়। কিন্তু যাহারা লইয়া যাইত, তাহাদিগকে দেখিয়া, আমরা শিশু, আমাদের ভূতের ভয় পর্য্যন্ত পলাইয়া যাইত।

মনসাপোতা আমাদের বাড়ীর কিছু দূরে। প্রায় প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে সেইখানে যাইতাম; এবং প্রকাণ্ড হরিদ্বর্ণ মাঠের আইলের উপর দিয়া যাইতে যাইতে দুই দিকের ধানক্ষেত হইতে ধানের শীষ ছিঁড়িতাম। তাহার পর মনসাপোতার প্রকাণ্ড হরিদ্বর্ণ মাঠে সূর্য্যাস্তজনিত প্রকাণ্ড ছায়া, খেঁক্‌শিয়ালের খেলা ও অদূরে বাগদীদের ঘরের চাল ভেদ করিয়া ধোঁয়া উঠিতে দেখিয়া কি যে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতাম, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। মনসাপোতায় গোটাকতক গর্ত্তে খেঁক্‌শিয়ালি থাকিত। আমরা সেখানে গিয়া দেখিতাম, একটা কাঁকড়া মুখে করিয়া, একটা মাছ মুখে করিয়া, বোঁ করিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া গর্ত্তে ঢুকিতেছে; তাই দেখিয়া আমরা হাত-তালি দিয়া উঠিতাম। ধনপোতা মনসাপোতার খানিক দক্ষিণে, উহার নিকটে মানুষের বাস দেখা যাইত না; সেখানে যাইতে গাটা যেন একটু ছম্ ছম্ করিত। একদিন একলা গিয়াছিলাম, বড় ভয় হইয়াছিল।

আর এক আনন্দের কথা বলি। বৈশাখ মাসে স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটী হইলে বাড়ী যাইতাম। গিয়া দেখিতাম, গ্রামের নদী শুষ্কপ্রায়! নদীতে মাছ ধরিবার সুবিধা। নদীর এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত চারি পাঁচ হাত অন্তরে দুইটা মাটীর বাঁধ

দেওয়া হইত, তাহাকে আমরা ডেঁ বলিতাম। দুই বাঁধেই একটা করিয়া 'ঘুনি' বসান হইত। দুই দিক্ হইতে চুণা মাছ আসিয়া ঘুনিতে ঢুকিত—মধ্যে মধ্যে ঘুনি তুলিয়া তাহা ঝাড়িয়া লওয়া হইত। এইরূপ করিয়া প্রতিদিন একমণ দেড়মণ চুণা মাছই ধরা হইত। আর বোয়াল প্রভৃতি বড় বড় মাছ দুই দিক্ হইতে জোড়ে আসিতে আসিতে বাঁধে বাধা পাইয়া বাঁধের মধ্যস্থিত খালে লাফাইয়া পড়িত। ডেঁতে যখন আর বেশী মাছ পড়িত না, তখন তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সমস্ত নদী গাবান হইত, অর্থাৎ নদীর জল এমনই আলোড়িত করা হইত যে, তলার পাঁক উপরে উঠিয়া পড়িত, সমস্ত জল ঘোলা হইত, আর সমস্ত মাছ তাড়া পাইয়া ভাসিয়া উঠিত। আমরা নদী গাবাইতাম, আর সেই মাছ ধরিতাম। উপরে অসংখ্য চিল উড়িতেছে, জলে অসংখ্য মাছ ছুটিতেছে, আমরা অদম্য সাহসে এবং অসীম আনন্দে একবেলা ধরিয়া পাঁক ভাঙ্গিয়া মাছ ধরিতেছি, আর সেই ডুমুর গাছের তলায় মাকাল ঠাকুরের পূজা হইতেছে!

আবার বৈশাখের অপরাহ্নে কালবৈশাখী কি অপূর্ব্ব সামগ্রী! তেমন কালবৈশাখী বুঝি এখন আর হয় না। দিগন্তব্যাপী কাল মেঘ, তাহার পরেই ঝড়; অমনই মেয়ে পুরুষ বালক বৃদ্ধ সকলেরই আম বাগানে যাওয়া। ঝড়ে আম পড়িতেছে—সেই আম কুড়ানো—যত আনন্দের কথা মনে উঠে, এ আনন্দ সে সব আনন্দের চেয়ে বেশী! আঁধার আকাশের নীচে আঁধার পৃথিবীতে আম পড়িতেছে—দেখা যাইতেছে না।

আম খুঁজিতেছি, আর চীৎকার করিতেছি—'খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি।' এমন করিয়া কত আম কুড়াইয়াছি, বলিতে পারি না।

আর একদিনের একটা পবিত্র ও প্রশান্ত আমোদের উল্লেখ করি। ইহা সেই পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে মাঠে লক্ষ্মী পূজার আমোদের কথা। প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে গণ্ডাচারেক গুড়পিঠা বা নূতন গুড়ের পরমান্ন দিয়া খান কুড়ি সরুচাকলি বা সুরতি পয়রা গুড় দিয়া দশ বারখানা বাসি লুচি না খাইয়া বাড়ীর বাহির হইতাম না। সে দিন কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিলে মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া আমরা চারি পাঁচ জনে ধানের শীষের এক একটা মোটা আটি বা গোছা হাতে লইয়া মনসাপোতায় যাইতাম। গিয়া দেখিতাম, রাইপিসী এবং কুড়ুনী দিদি আমন নৈবেদ্য ফুল তুলসী শাঁক ঘণ্টা কাঁসর প্রভৃতি সব আনিয়াছেন। একটু বেলা হইলে ব্রাহ্মণ আসিয়া লক্ষ্মীপূজা করিতেন। আমরা আহ্লাদে এত জোরে কাঁসর বাজাইতাম যে, দুই একবার কাঁসর ফাটিয়া গিয়াছিল। তাহার পর আমাদের খাওয়া আরম্ভ হইত। একজন ময়রা একটা ধামায় করিয়া নূতন গুড়ের মুড়কী, মোয়া প্রভৃতি বেচিতে আসিত। ধানের শীষের গোছা বা আটি তাহাকে দিয়া আমরা খাবার কিনিয়া খাইতাম এবং যে সব গরীব বাগদীর ছেলে মেয়ে পূজা দেখিতে আসিত, তাহাদিগকে খাওয়াইতাম।

শীত ও বসন্ত।

—):*:(—

যে অনন্ত নীল আকাশ দেখিতে এত সুন্দর, এত সু
—যে অনন্ত আকাশে অসংখ্য নক্ষত্ররাজি পরিবেষ্টিত, অনন্ত-জন্মে, শোভায় শোভিত চন্দ্র-মণ্ডল দেখিলে এত আহ্লাদ, এত উল্লাস শীতকালে সে সব কিছুই থাকে না। পৃথিবী হইতে কি এক রকম ধূমবৎ কুরূপ এবং স্ফূর্ত্তিনাশক বাষ্প উঠিয়া মানুষের চক্ষু এবং আকাশরূপ অনন্ত সৌন্দর্য্যের আবাসস্থলের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ায়। মানুষ অতুলরূপের পরিবর্ত্তে অসহনীয় কুরূপ দেখিতে থাকে। দ্রষ্টব্য জগতের উপরার্দ্ধ বিকৃত হইয়া পড়ে, তাহা দেখিতে ইচ্ছা হয় না, দেখিলে বিরক্তি জন্মে এবং মন খারাপ হইয়া যায়। জগতের নিম্নার্দ্ধও তদ্রূপ। মনোহর বৃক্ষলতা-মণ্ডিত তটভূমিবেষ্টিত স্বচ্ছ-সলিল হ্রদ, প্রস্ফুটিত পদ্মশোভিত সুনির্ম্মল বারিপূর্ণ সরোবর, পর্ব্বতোদ্ভূতা ক্রীড়াময়ী রঙ্গপ্রিয়া চঞ্চলনেত্রা মধুরভাষিণী স্রোতস্বিনী, সুদূরবিস্তৃত গাম্ভীর্য্যময় গর্জ্জনপ্রিয় বাত্যান্দোলিত সুনীল স্ফীতবক্ষ সমুদ্র—এ সকলই শীতকালে সেই বিস্তৃত কুরূপ স্ফূর্ত্তিনাশক বাষ্পরাশিতে আবৃত। ইহাদের সমস্ত রূপ—সমস্ত সৌন্দর্য্য অনন্ত আকাশের অতুল সৌন্দর্য্যের ন্যায় বিলুপ্ত বা কলুষিত। পৃথিবী এবং আকাশ একটা ঘোলা আবরণে আবৃত। দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্ত হয় এমন কিছুই নাই। বৃক্ষে পত্র নাই। বৃক্ষের শাখাগুলি এক একখানা দগ্ধ

কাষ্ঠের ন্যায় এদিকে ওদিকে প্রসারিত। বৃক্ষটা যেন মৃত্যুর মূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। কীট, পতঙ্গ, পশু কেহই ক্রীড়া করিতেছে না। সকলেই যেন মরিয়া রহিয়াছে। কি অদূরে কি সুদূরে, কোথাও পাখীর ডাক শুনা যায় না। মনুষের বাহ্য জগতের সহিত যেন সম্পর্ক নাই। মানুষ শীতে জড়সড় হইয়া পড়িয়াছে। রোগী রোগ ঝাড়িয়া রোগশয্যা ছাড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। পৃথিবী হিমময়। জড় জগতের শ্রী, জড় জগতের সৌন্দর্য্য, সকলই বিলুপ্ত।

ক্রমে সূর্য্যদেব দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণে গমন করিলেন। তাঁহার নিস্তেজমূর্ত্তি সতেজ ভাব ধারণ করিল। পৃথিবী তাপ অনুভব করিতে লাগিল।

এখন দেখ দেখি, পৃথিবীতে কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ফুটিয়াছে! যে কুরূপ, স্ফূর্ত্তিনাশক বাষ্পরাশি সুন্দর আকাশ এবং সুন্দর পৃথিবীকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, সেই বাষ্পরাশি কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। উপরে ঘন নীল আকাশ, নীচে নীল সমুদ্র, স্বচ্ছ-সলিলা স্রোতস্বিনী এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম-শোভিত সরোবর হাসিতেছে। মৃত বৃক্ষ প্রাণ পাইয়াছে, তাহার প্রতিশাখা এবং প্রশাখা ছোট ছোট কচি পাতায় আবৃত। সেই সকল পাতার ভিতর ছোট ছোট পাখী খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। মরা গাছ যেন একটী নবজাত শিশুর শোভায় পরিশোভিত হইয়াছে। আজ যেদিকে চাই, সেই দিকেই সৌন্দর্য্য, সেই দিকেই জীবনীশক্তির রমণীয় স্ফূর্ত্তি। আজ মানুষ,

বৃক্ষ লতা আকাশ প্রভৃতির শোভা দেখিয়া বেড়াইতেছে। আজ শীতক্লিষ্ট কাঙ্গাল এবং কৃষক হাসিয়া কথা কহিতেছে। আজ রোগী রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ কীট পতঙ্গ পশু আনন্দে ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছে। আজ কি অদূরে, কি সুদূরে সর্ব্বত্রই সুকণ্ঠ পক্ষী গলা ছাড়িয়া গীত গাহিতেছে। আজ পৃথিবীর স্ফূর্ত্তি আকাশের স্ফূর্ত্তিতে মিশিয়াছে। আর এই আজিকার তপনতাপজনিত অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তির দিনে উদ্যানে, প্রাঙ্গণে, কাননে, কান্তারে ফুট্‌ফুট্‌ করিয়া রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া পড়িতেছে!

পূজার আনন্দ।

৭ই আশ্বিন সপ্তমী পূজা। ৪ঠা আশ্বিন স্কুল করিয়া ছুটী হইবে। আমরা ৫ই আশ্বিন বাড়ী যাইব। ৫ই আশ্বিনের জন্য আমরা ধড়্‌ফড়্‌ করিতেছি। আজ ২৯শে শ্রাবণ। আমরা সাতটী সমবয়স্ক ছেলে এক বাড়ীতে থাকিতাম। কর্ত্তারা আমাদিগকে রাত্রি নয়টার সময় শুইবার অনুমতি করিয়াছিলেন। কিন্তু পরদিনের পড়া যতক্ষণ না নিখুঁতরূপে আয়ত্ত হইত, ততক্ষণ আমরা শুইতাম না। শুইতে কোন দিন ১০টা, কোন দিন ১১টা, কোন দিন বা ১২টা বাজিয়া যাইত। তথাপি

পূজার আনন্দ

পূজা যখন নিকটবর্ত্তী হইত, তখন আমরা কয়জনে সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বে উঠিয়া একত্র হইতাম এবং বাড়ী যাইবার আর ৩৫ দিন আছে, এই বলিয়া একটু চাপা রকম হাসিতাম। তাহার পরদিন আবার তেমনি একত্র হইয়া বলিতাম, আর ৩৪ দিন আছে এবং সেই সঙ্গে চাপা রকম হাসিতাম। এইরূপে যখন ৪ঠা আশ্বিন আসিত তখন আবার সূর্য্যোদয়ের ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে উঠিয়া তেমনি একত্রে হইয়া 'কাল হে কাল' মহোল্লাসে এই কথা বলিতাম, আর শব্দ না হয় এমনি করিয়া নাচিতাম, কারণ কর্ত্তারা তখনও নিদ্রিত।

আজ ৫ই আশ্বিন, আজ বাড়ী যাইব। পূজার সময় বাড়ী যাইবার যে এত আনন্দ, তাহা কার্ত্তিকের জন্য ভাল পাগ্‌ড়ি কিনিয়া লইয়া যাইতাম বলিয়া কত যে বাড়িয়া যাইত, তাহা আর কি বলিব! স্কুলে জল খাইবার জন্য যে পয়সা পাইতাম তাহাই বাঁচাইয়া বাঁচাইয়া কার্ত্তিকের জন্য ভাল পাগ্‌ড়ি এবং আটচালায় জ্বালাইবার জন্য একটি লণ্ঠন কিনিয়া লইয়া যাইতাম। কর্ত্তাদের প্রতিমায় সাজসজ্জার দিকে বেশী দৃষ্টি ছিল না। তাঁহাদের বেশী দৃষ্টি ছিল কাঙ্গালী বিদায়ের দিকে এবং লোক-জনের ভোজনের দিকে। আমরা বালক, প্রতিমার সাজসজ্জা ভাল হয়, আমাদের তখন তাহাই ইচ্ছা। তাই আমরা আপন হাতে প্রতিমা সাজাইতাম; এবং কার্ত্তিকের জন্য ভাল পাগ্‌ড়ি কিনিয়া লইয়া যাইতাম। আর কর্ত্তাদের বাহারের দিকে দৃষ্টি ছিল না বলিয়া আমাদের তত বড় আটচালায় চারিটির

বেশী বড় লণ্ঠন জ্বলিত না। সেটা আমাদের ভাল লাগিত না। তাই আমরা প্রতিবৎসর একটা করিয়া ছোট লণ্ঠন কিনিয়া লইয়া যাইতাম। আর সেই লণ্ঠনটি যখন জ্বলিত, তখন ভাবিতাম, আমাদের 'খুদে' লণ্ঠনটি বড় বড় লণ্ঠনগুলির অপেক্ষাও বড়। এই সব করিয়াও যে ক্ষোভটুকু থাকিত তাহা মিটাইবার জন্য সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী, চারিদিন খুব ভোরে উঠিয়া স্নান করিয়া আটচালায় সমস্ত নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া দিতাম এবং কয়দিনই সন্ধ্যার আরতি হইয়া গেলে আমরা মহা আনন্দে আটচালায় নাচিতাম; ঢুলী নাচের বাজনা বাজাইত, আর আমরা নাচিতাম।

সন্ধিপূজা দুর্গাপূজার সর্ব্বপ্রধান অংশ। কিন্তু গভীর রাত্রিতে সন্ধিপূজা না হইলে আমাদের মন খারাপ হইত। গভীর রাত্রিতে হইলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকিত না। আজ রাত্রিতে সন্ধিপূজা, সকাল হইতে মেয়ে পুরুষ পাড়াপ্রতিবেশী সকলেরই মুখে কেবল ঐ কথা। সন্ধ্যার সময় 'তাঁবি' বসিল। সেটা কি বোধ হয় অনেকে জানেন না। যখন ঘড়ি ছিল না, তখন সন্ধিপূজার মুহূর্ত্ত নিরূপণ করিবার জন্য তাঁবি পাতা হইত। আমাদের পাড়ার আচার্য্যেরা আমাদের বাড়ীতে তাঁবি পাতিতেন। ঠিক সূর্য্যাস্তের সময়, বৈঠকখানায় একটা নূতন হাঁড়িতে এক হাঁড়ি জল বসান হইত। একটি পাতলা তামার বাটির তলায় এমন একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকিত যে, বাটিটি হাঁড়ির জলের উপর বসাইয়া দিলে যতক্ষণে জলপূর্ণ হইয়া ডুবিয়া যাইত,

ততক্ষণে ১ দণ্ড হইত। ডুবিবামাত্র উহা তুলিয়া আবার বসাইতে হইত। উহা যতবার ডুবিত, হাঁড়ির গায়ে ততবার এক একটি চূণের দাগ দেওয়া হইত। তাহাতে দণ্ডের সংখ্যা ঠিক থাকিত। রাত্রি যত দণ্ড হইলে সন্ধিপূজা আরম্ভ হইবে হাঁড়ির গায়ে ততগুলি চূণের দাগ পড়িলেই পূজারী মহাশয়কে চেঁচাইয়া বলা হইত, মহাশয়, এতবার তাঁবি পড়িয়াছে। সন্ধিপূজা আরম্ভ হইবে শুনিলে, আমি তাঁবির জায়গা ছাড়িয়া চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধি-পূজার মন্ত্র শুনিতে যাইতাম। তথায় গিয়া দেখিতাম, আমাদের বাড়ীর সমস্ত স্ত্রীলোক সেখানে গলায় কাপড় দিয়া জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। চণ্ডীমণ্ডপ ধূনার ধোঁয়াতে পরিপূর্ণ, প্রতিমা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, আর চণ্ডীমণ্ডপে ৺কালী-পূজার দীপান্বিতার ন্যায় অসংখ্য দুর্গাপ্রদীপ জ্বলিতেছে। এত স্ত্রী ও পুরুষ, কিন্তু কাহারও মুখে কথাটি নাই, এমন কি চপল চঞ্চল বালকেরা পর্য্যন্ত নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ; ঢাকী ঢুলী ঢাক ঢোল ঘাড়ে করিয়া তাহাদের সেই একচালাখানি ছাড়িয়া আটচালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; স্ত্রীলোকেরা থাকিয়া থাকিয়া 'মা গো' 'মা গো' শব্দ করিতেছেন; কর্ত্তারা যেন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া আছেন; ধূনার ধোঁয়ায় আটচালা পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক সন্ধিপূজার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আনন্দের কথা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিন দিন এইরূপ উল্লাসে কাটাইয়া দশমীর ভোরে বাজনা শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিল; অমনি প্রাণ যেন

কাঁপিয়া উঠিল—আজ যে বিজয়া, মা আজ বাড়ী যাইবেন। স্নান করিয়া নৈবেদ্য করিয়া দিলাম। কিন্তু আজ নৈবেদ্যের সংখ্যা অল্প, প্রধান নৈবেদ্য একেবারেই নাই। মন বড় খারাপ, আনন্দের পরিবর্ত্তে আজ ঘোর নিরানন্দ—কিন্তু বড় আনন্দময় নিরানন্দ। আনন্দময়ী তিন দিন—তিন দিন কেন—তিন মাসের অধিক আনন্দ দান করিয়া বাড়ী যাইবেন বলিয়া আজ আনন্দময় নিরানন্দ—আনন্দাত্মক বিষাদ।

চণ্ডীমণ্ডপে দর্পণবিসর্জ্জন আরম্ভ হইল। স্ত্রীলোকেরা আজ মলিন বস্ত্র পরিয়া গলায় কাপড় দিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন। কর্ত্তারা বৈঠকখানা ছাড়িয়া চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়াছেন—আটচালায় অসংখ্য গ্রামবাসী সমবেত হইয়াছেন। তন্ত্রধারক ঘোষাল মহাশয় মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। ঘোষাল মহাশয়ের গলা বড় মিষ্ট ছিল, এবং অনুরাগভরে কথা কহিলে সে গলা একটু কাঁপিত। সেই মিষ্ট গলায় ঈষৎ কম্পিতস্বরে ঘোষাল মহাশয় মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন ঃ—

গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি।
সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ॥

মন্ত্র শুনিয়া সকলেরই চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল।

সন্ধ্যা সমাগত। প্রতিমা নদীতে নিক্ষেপ করিবার সময় হইয়াছে। প্রতিমা চণ্ডীমণ্ডপ হইতে আটচালায় নামান

হইয়াছে। পুরুষেরা বাটীর বাহিরে গিয়াছেন—ঢাকী ঢুলী বাটীর বাহিরে গিয়া বিসর্জ্জনের বাজনা আরম্ভ করিয়াছে। সদর দরজা বন্ধ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা মাকে বরণ করিতে আসিয়াছেন। জলের ঝারা দিয়া তাঁহারা প্রতিমা প্রদক্ষিণ করিলেন। তাহার পর মাকে বরণ করিলেন। সর্ব্বশেষে আমার মা প্রতিমার পিছনে দাঁড়াইয়া বস্ত্রাঞ্চল পাতিলেন, আমার পিতা সম্মুখ দিক্ হইতে তাহাতে কনকাঞ্জলি অর্থাৎ থালা সমেত চা'ল ও টাকা ফেলিয়া দিলেন। তখন পুরুষেরা প্রতিমা নদীতীরে লইয়া গেলেন।

প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর বাড়ীতে ঢুকিয়া চণ্ডীমণ্ডপ শূন্য দেখিয়া বুক ফাটিয়া যাইত। কিন্তু তখনই আবার আহ্লাদে হৃদয় নাচিয়া উঠিত। সে কিসের আহ্লাদ বলি শুন। বিজয়া দশমীর দিন, বাঙ্গালার স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা ধনী নির্ধন সকলেই আপন আপন অবস্থানুসারে নূতন বস্ত্রাদি পরিয়া থাকে। আমরাও পরিতাম। কিন্তু সেজন্য তখন আমার এত আহ্লাদ হইত কেন, খুলিয়া না বলিলে কেহই বুঝিতে পারিবেন না। আমি এবং আমার দাদা, আমাদের বাপের আমরা দুইটি মাত্র পুত্র ছিলাম। বাবা কখন আমাদিগকে ভাল কাপড় জুতা দিতেন না। আমরা সংবৎসর মোটা কাপড় পরিয়া, মোটা মার্কিণ থানের পিরাণ এবং মুড়ি-শেলাই চাদর গায়ে দিয়া ও নাগরা জুতা পায় দিয়া স্কুলে বল, নিমন্ত্রণে বল, সর্ব্বত্রই যাইতাম। কেবল পূজার সময় বাবা আমাদের দুই ভাইকে একখানি করিয়া ঢাকাই কাপড় ও চাদর,

একটি করিয়া সাদা ফুলতোলা কাপড়ের জামা, এক জোড়া করিয়া সাদা মোজা এবং এক জোড়া করিয়া জরির জুতা দিতেন। সেগুলি আমরা বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা-বিসর্জ্জন হইয়া গেলে পরিধান করিয়া সকলকে প্রণাম করিয়া বেড়াইতাম। সেই কাপড় জুতা পরিবার আনন্দের প্রত্যাশায় সংবৎসর থাকিতাম। তাই বিসর্জ্জন-জনিত অত বিষাদের মধ্যেও আনন্দ।

প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া দেখিতাম আটচালা জুড়িয়া মাদুর পাতা হইয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপে স্ত্রীলোকেরা বসিয়াছেন। ঘোষাল মহাশয় এবং আমাদের কুলপুরোহিত সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বকনিষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রত্যেকের মস্তকে মায়ের অর্ঘ্য বুলাইয়া, আম্রশাখা দ্বারা সর্ব্বশরীরে শান্তিজল সেচন করিতেন। তাহার পর জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ অনুসারে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠদিগকে প্রণাম করিত, তাঁহাদের পায়ের ধূলা ও আশীর্ব্বাদ লইয়া তাঁহাদের সহিত কোলাকুলি করিত। অনন্তর অন্দরে গিয়া স্ত্রীলোকদিগকে প্রণাম করিতাম এবং তাঁহাদের পায়ের ধূলা লইতাম, তাঁহারাও আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। আমরা আর এক বাড়ীতে যাইতাম, সেখানেও ঐরূপ হইত এবং রসকরা বা খৈচুর একটু একটু খাইতাম। বাগ্দীপাড়ায় এবং চাষাপাড়ায় গিয়াও এইরূপ প্রণাম করিতাম ও পায়ের ধূলা লইতাম, আর প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ লইয়া নাচিতে নাচিতে ফিরিয়া আসিতাম। তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর।

ফুল ও নক্ষত্র

-০:০:০-

ফুল এবং নক্ষত্র এই দুইটি কি অপূর্ব্ব পদার্থ! ইহাদের সম্বন্ধে যতই চিন্তা করা যায় ততই বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়।

একটু ভাবিয়া দেখ। মনুষ্যের ইতিহাসের যুগযুগান্তরের পিছনে গিয়া দাঁড়াও। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি ভুলিয়া যাও; গ্রীস, রোম, পারস্য ভুলিয়া যাও; তাজমহল, পার্থিনন, ভুবনেশ্বর, কোণার্ক ভুলিয়া যাও। সব ভুলিয়া সভ্যতাবিহীন, শাস্ত্রবিহীন, ইতিহাসবিহীন, বেশভূষাবিহীন কালদীয়া (Chaldea) দেশীয় মেষপালকদিগের মধ্যে গিয়া দেখ তাহারা কি করিতেছে। দেখিবে, তাহারা দিনে মেষ চরাইতেছে, রাত্রিতে নক্ষত্র ভাবিতেছে। তারপর সেই আদিম কাল হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমান শতাব্দীতে প্রবেশ কর। বরাবর দেখিবে মানুষের এক চক্ষু পৃথিবীতে আর এক চক্ষু আকাশের নক্ষত্রে। নক্ষত্র মনুষ্যের চিরন্তন চিন্তা ও গূঢ়নিহিত কৌতূহলের সামগ্রী।

আবার পিছাইয়া যাও—সোণা, রূপা, মণি, মুক্তা, বস্ত্র, অলঙ্কার, গৃহ, অট্টালিকা, অর্ণবযান, বাষ্পীয়যান, প্রভৃতি সমস্ত বাহ্যসম্পদ্ ভুলিয়া আদিম মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া আদিম মনুষ্যকে দেখ। দেখিবে, তোমার যাহা আছে, তাহার সে সব কিছুই নাই। কেবল তোমার যে ফুলটি আছে তাহারও সেই

ফুলটি আছে। তারপর ধীরে ধীরে আসিয়া বর্ত্তমান শতাব্দীর চাক্‌চিক্যের প্রতি চাহিয়া দেখ। বরাবর দেখিবে, মানুষ সব পরিবর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু যে ফুল প্রথমে তুলিয়া পরিয়াছিল, এখনও সেই ফুল তুলিয়া পরিতেছে। ফুল মানুষের চিরন্তন সাধের ও আবহমান অনুরাগের বস্তু।

ফুল যথার্থই মানব-গুরু। কেন, বলি শুন। দেখ মানুষে মানুষ আছে আর পশু আছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা, পশুত্বটুকু নষ্ট করিয়া মনুষ্যত্বটুকু প্রবল করে। সেই নিমিত্ত মানুষ পৃথিবীতে উদ্ভূত হওয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত কত চেষ্টা করিয়াছে। কত ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে, কত দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছে, কত স্কুল কলেজ, টোল করিয়াছে, কত দেশ ভ্রমণ করিয়াছে। কিন্তু এই প্রভূত চেষ্টার প্রথম কার্য্য ফুল তোলা। যেদিন আদিম মনুষ্য পশুর ন্যায় ক্ষুধার জ্বালায় মহারণ্যে বিচরণ করিয়া পশুবধপূর্ব্বক মধ্যাহ্নে বৃক্ষমূলে বসিয়া কাঁচা মাংস চিবাইয়া খাইয়া সহচর সিংহ-ব্যাঘ্রের ন্যায় নিদ্রার দ্বারা ক্লান্ত দেহের শান্তি সম্পাদন করিয়া অপরাহ্নে অস্তাচলগামী সূর্য্যের মৃদুমধুর সুবর্ণ জ্যোতি দেখিয়া, কি জানি কেন, সেই পবনান্দোলিত বিলম্বিত লতা হইতে একটি সুবর্ণ জ্যোতি পুষ্প ছিঁড়িয়া মাথার চুলে গুঁজিল, সেইদিন মনুষ্যের বিশাল ইতিহাসের সূত্রপাত হইল। সেইদিন জানা গেল যে মহারণ্যনিবাসী সিংহ ব্যাঘ্র অনন্ত কাল মহারণ্যেই বাস করিবে, কিন্তু তাহাদের আদিম সহচর মনুষ্য মহারণ্য বিনষ্ট করিয়া মহাসম্পদের সৃষ্টি করিবে। সেইদিন জানা গেল যে,

সিংহ ব্যাঘ্রে কেবল পৃথিবী আছে, কিন্তু মানুষে পৃথিবী এবং স্বর্গ দুই-ই আছে। সেইদিন জানা গেল যে, সিংহ ব্যাঘ্র চিরকাল নত-শিরে পৃথিবীতে বিচরণ করিবে, কিন্তু মানুষ অনন্ত আকাশ ভেদ করিয়া বিশ্বের ঊর্দ্ধতম প্রদেশে প্রবেশ করিবে। সেই দিন মনুষ্যের অনন্ত শিক্ষার, অনন্ত উন্নতির সূত্রপাত হইল। সেই শিক্ষা, সেই উন্নতির মূলে ক্ষুদ্র, কোমল, কমনীয় ফুল।

পাখী।

—•:*:•—

দ্বারে একটি পাখী। বন্ধু নয়, ভিখারী নয়, অতিথি নয়, একটি পাখী। আমি কখনও পাখী পুষি নাই—তবে আমার দ্বারে পাখী কেন? মানুষটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'এখানে পাখী আনিলে কেন?' সে বলিল—'পাখী পুষিবেন কি?' পাখী কখনও পুষি নাই, পুষিবার সাধও হয় নাই। যদি বা কখনও পাখী পুষিবার কথা মনে করিয়াছি বা কাহাকেও পুষিতে দেখিয়াছি, তখনই ভাবিয়াছি—বনের পাখী বনে থাকিলেই ভাল থাকে—যে অনন্ত আকাশে উড়িয়া বেড়ায় তাহাকে ক্ষুদ্র খাঁচায় পুরিলে সে বড় ক্লেশ পায়। এই ভাবিয়া কখন পাখী পুষি নাই এবং কাহাকেও পুষিতে দেখিলে দুঃখ বৈ সুখ পাই নাই। কিন্তু মানুষটি যখন আবার বলিল—পাখী পুষিবেন কি—কি জানি

কেন, মনটা কেমন হইয়া গেল। মনে হইল বুঝি আমি পাখীটিকে না লইলে মানুষটি তাহাকে কত কষ্ট দিবে—পাখীটিকে ধরিয়া কত কষ্ট দিয়াছে—আরো কত কষ্ট দিবে। এই ভাবিয়া মনটা কেমন হইয়া গেল। তাহাতে আবার দেখিলাম যে, পাখীটি যেন নির্জীব হইয়াছে, ভাল করিয়া ধুঁকিতেও পারিতেছে না—ভয়ে জড়সড় হইয়াছে, বুঝি বা কতই আকুল হইয়াছে—বুঝি বা তাহার ক্ষুদ্র কণ্ঠ কতই শুকাইয়া উঠিয়াছে। বড় দুঃখ হইল। আমি বলিলাম—পুষিব। মানুষটি বলিল,—আটটি পয়সা পাই-লেই পাখীটি দি। পাখীটি যেন ধুঁকিতেও পারিতেছে না—দর দাম করিতে গেলে বা মারা যায়। তৎক্ষণাৎ আটটি পয়সা দিয়া পাখীটি লইলাম এবং এক প্রতিবেশীর নিকট হইতে একটা খাঁচা লইয়া পাখীটিকে তাহাতে রাখিয়া দুধ, ছাতু ও জল খাইতে দিলাম। দিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। তবু পাখীটি খাইল না। অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রে আস্তে আস্তে ধুঁকিতে লাগিল। মনে হইল বুঝি আমাকে দুসমন্ ভাবিয়া ভয়ে খাইতেছে না। একটু সরিয়া গেলাম। পাখীটি আমাকে আর দেখিতে পাইল না। খানিক পরেই একটু ছাতু ও জল খাইল। আমি বুঝিলাম—আমাকে দুসমন্ ভাবিয়াই পাখী এতক্ষণ খায় নাই।

পাখীর উপর মায়া হইল। সে দিন আর পাখীর কাছে গেলাম না। প্রাতে উঠিয়া দেখি পাখী দিব্য খাওয়া দাওয়া করিয়াছে। ছাতুর বাটিতে ছাতু প্রায় নাই, জলের বাটিতে জলও

কিছু কম এবং খাঁচার নীচে মেজের উপর কিছু ছাতুর গুঁড়া এবং দুইচারি ফোঁটা জল পড়িয়া আছে। বড় আহ্লাদ হইল। পাখীর কাছে গেলাম। পাখী সরিয়া খাঁচার এক কোণে গিয়া বসিল। প্রায় একঘণ্টা কাল সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। পাখীও সেই একঘণ্টা কাল সেই কোণে বসিয়া রহিল, কিছুই খাইল না। আমি সরিয়া আসিলাম—পাখীও খাইতে লাগিল। তখন আবার ভাবিলাম—পাখী আমাকে এখনও দুসমন্ ভাবিয়া খাইতেছে না।

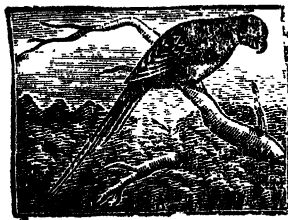
আরো দুইচারি দিন গেল। আবার একবার পাখীর কাছে গেলাম। দেখি সেখানে আমার একটি ছোট ছেলে বসিয়া আছে। পাখী আমাকে দেখিয়া আর তেমন করিয়া সরিয়া গেল না। ছেলেটিকে কোলে করিয়া আমি তাহার সহিত পাখীর কথা কহিতে লাগিলাম। পাখী খাইতে লাগিল। বুঝিলাম পাখী খাঁচা চিনিয়াছে। মনে দুঃখ উথলিয়া উঠিল। অনন্ত আকাশে উড়িয়া উড়িয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, উঠিয়া উঠিয়া, নামিয়া নামিয়া, যার আশ মিটে না, কেন তাহাকে, হায় হায়, কেন তাহাকে ক্ষুদ্র খাঁচায় পুরিলাম! কেন তাহাকে ক্ষুদ্র খাঁচা চিনাইলাম! কেন তাহাকে অনন্ত ভুলাইলাম! দুই একদিন বড়ই কষ্টে গেল। এক একবার মনে হইতে লাগিল, পাখীকে উড়াইয়া দিই। একবার খাঁচার দ্বার খুলিয়া দিলাম। পাখী উড়িয়া গিয়া একটা জানালার উপর বসিল। আবার মনটা কেমন করিতে লাগিল—পাখী পলায় ভাবিয়া প্রাণটা কেমন হইয়া গেল

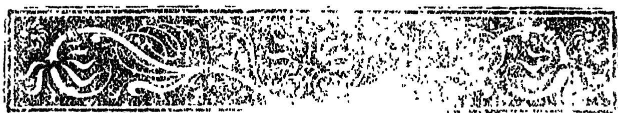
—অমনি পাখীকে ধরিয়া আবার খাঁচায় পুরিলাম। আপনার কাছে আপনি হারিলাম।

একদিন ছেলেগুলিকে লইয়া পাখীর কাছে বসিলাম। পাখী যেন কতই আহ্লাদিত হইয়া খাঁচার ভিতর লাফালাফি করিতে লাগিল এবং একবার এ ছেলেটির দিকে, একবার ও ছেলেটির দিকে যাইতে লাগিল। আমরা সকলে আহ্লাদে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলাম এবং করতালি দিতে লাগিলাম। পাখী ভয় পাইল না—তেমনি লাফালাফি করিতে লাগিল। আমি একটু ছাতু লইয়া পাখীকে খাইতে দিলাম—পাখী খাইল না। আমার একটি ছেলে একটু ছাতু লইয়া খাইতে দিল, পাখী টুপ্ করিয়া খাইয়া ফেলিল। মনে হইল আমার ছেলেগুলির সহিত পাখীর ভ্রাতৃভাব হইয়াছে—ছেলেগুলিকে বলিলাম, ওটি তোমাদের ভাই।

সেইদিন হইতে পাখীটিও আমার ছেলে হইল। পাখীকে আমার হৃদয়ের খাঁচায় পুরিলাম। সে খাঁচার সীমা নাই, অর্গল-যুক্ত দ্বার নাই, আশে-পাশে মাথায় ঠেকে এমন কাটির কৌশল নাই। পাখীকে সেই অসীম অনন্ত অতলস্পর্শ খাঁচায় পুরিলাম। মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। পাখীও আর তাহার বাঁশের খাঁচায় এখানে ওখানে ঠোঁট গলাইয়া পলাইবার চেষ্টা করে না। এখন বাঁশের খাঁচার দ্বার খুলিয়া রাখি, পাখী উড়িয়া যায় না। খাঁচার দ্বার খুলিয়া রাখিলে পাখী এক-আধবার আমার কাছে আসে, এক-আধবার আমার ছেলেদের কাছে আসে। আবার নাচিতে নাচিতে খাঁচার ভিতর গিয়া বসে। খাঁচা এখন পাখীর বড় মিষ্ট

লাগে। আমি এখন পাখীর সহিত কত কথা কই, পাখীও আমার সহিত কত কথা কয়—যেন কত আদরের, কত আব্‌দারের কথা কয়, কত হাসে, কত কাঁদে, কত অভিমান করে, কত ভাব করে, কত ভ্রূকুটি করে। পাখীকে আমি কত-রকম করিয়া দেখি, পাখীও আমাকে কত রকম করিয়া দেখে। পাখীর খাঁচা খুলিয়া দি। পাখী আসিয়া আমার কাঁধের উপরে বসে, আমার হাতের উপরে বসিয়া ছাতু খায়। আমি এখন আর পাখীর সে দুসমন্ নই। পাখী এখন আমাতে মজিয়াছে। এখন অনন্ত আকাশ হৃদয়ের অনন্তত্বে ডুবিয়া গিয়াছে। পাখী এখন আর অনন্ত আকাশ খোঁজে না, তাহার অনন্ত আকাশের আকাঙ্ক্ষা আর নাই। সে এখন আকাশের অনন্তত্ব ভুলিয়া হৃদয়ের অনন্তত্বে মিলাইয়া গিয়াছে। তাহার কি আর তুচ্ছ আকাশের কথা মনে থাকে ?





দ্বিতীয় অধ্যায়



সুনীতি ও সদাচার।



জ্ঞাতি ও কুটুম্ব



একবংশজাত ব্যক্তিগণ পরস্পরের জ্ঞাতি এবং বিবাহ-সূত্রে যাঁহাদের সহিত সম্পর্ক জন্মে তাঁহারা কুটুম্ব। জ্ঞাতি ও কুটুম্ব বলিতে মোটামুটি ইহাই বুঝায়। জ্ঞাতিদিগের পূর্ব্বপুরুষ এক। পূর্ব্বপুরুষ পরম পূজনীয়। পূর্ব্বপুরুষের নাম শুনিলে মন আনন্দ ও সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। অতএব পূর্ব্বপুরুষকে ধরিয়া যাঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধ, তাঁহারা বড় আপনার বস্তু, আদরের সামগ্রী। তাঁহাদিগের সহিত কখন বিবাদ-বিসম্বাদ করিও না। বিষয়সম্পত্তি লইয়া যদি তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ হওয়া সম্ভব বোধ হয়, তবে বিবাদ ঘটিবার অগ্রেই সদ্ভাবের সহিত বিষয়সম্পত্তি পৃথক্ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। জ্ঞাতির সহিত একবার সম্পত্তিঘটিত বিবাদ বাধিলে তাহা শীঘ্র শেষ হয় না এবং বিষয়সম্পত্তি ছাড়া অন্যান্য অনেক রকমের বিবাদও

উপস্থিত হইয়া থাকে। জ্ঞাতিবিবাদে হিংসা, দ্বেষ, জিগীষা, নির্য্যাতনস্পৃহা প্রভৃতি বিষম দুষ্প্রবৃত্তি সকল প্রবলভাবে মনকে অধিকার করিয়া যেরূপ তীব্রভাবে কার্য্য করে, তাহাতে মানসিক প্রকৃতি যার পরনাই হীনতা প্রাপ্ত হয়। অতএব জ্ঞাতির সহিত বিবাদের কারণ লক্ষিত হইবামাত্র যত্নসহকারে তাহার উচ্ছেদ-সাধন করা কর্ত্তব্য।

জ্ঞাতির সহিত বিষয়সম্পত্তির কোন সংস্রব না থাকিলেও, অনেকে তাঁহার অবস্থার উন্নতি দেখিলে তাঁহাকে হিংসা করিয়া থাকেন এবং তিনি যাহাতে শ্রীহীন হইয়া পড়েন সেই উদ্দেশে তাঁহার শত্রুতাও করেন। সৌভাগ্যবান্ জ্ঞাতির প্রতি এরূপ ঈর্ষাভাব বা বৈরিতাচরণ নিতান্ত দুর্ব্বৃত্ততার লক্ষণ। সুবোধ সুনীতিপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রই ইহা ঘৃণা করিয়া থাকেন। জ্ঞাতির উন্নতিতে বংশের গৌরব বৃদ্ধি হয় এবং পূর্ব্বপুরুষগণের নাম উজ্জ্বল হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞাতির উন্নতিতে ম্রিয়মাণ বা ঈর্ষান্বিত না হইয়া কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত জ্ঞান করা উচিত। জ্ঞাতির সৌভাগ্য দেখিয়া যাহার মনঃকষ্ট হয় সে বংশের কলঙ্ক।

অনেক ধনবান্ বা সৌভাগ্যবান্ জ্ঞাতি দরিদ্র অপেক্ষা-কৃত হীনাবস্থাপন্ন জ্ঞাতিকে অবজ্ঞা করিয়া মনঃকষ্ট দিয়া থাকেন। ইহা অতিশয় দূষণীয় ও নিন্দার্হ। ধন হইলে সকলেরই নম্র, বিনয়ী, পরোপকারী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে হয়। নহিলে ধন নৈতিক অবনতি ও সামাজিক প্রতিপত্তিনাশের কারণ হইয়া থাকে। ধন হইলে জ্ঞাতির সম্বন্ধে অধিকতর

নম্র, বিনয়ী, হিতকারী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও স্নেহবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। দরিদ্র জ্ঞাতিরা যাহাতে ধনবান্ জ্ঞাতির সৌভাগ্যে সৌভাগ্যশালী মনে করেন, দরিদ্র জ্ঞাতির প্রতি ধনবান্ জ্ঞাতির এরূপ ব্যবহার হওয়া একান্ত আবশ্যক। সকল ক্রিয়াকর্ম্মে জ্ঞাতিদিগকে বিশেষ স্নেহ ও সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের পরামর্শাদি গ্রহণ করিয়া ও তাঁহাদের ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে জ্ঞাতিগণের মধ্যে সমস্ত অসূয়ার ভাব বিদূরিত হইয়া সৌহার্দ্দভাব পরিবর্দ্ধিত হইবে। সকল জ্ঞাতি এক পূর্ব্বপুরুষের সন্তান বলিয়া পরস্পরের সুখ দুঃখে ও মান অপমানে সুখ দুঃখ ও মান অপমান অনুভব করিবে, এবং আপনা-আপনির মধ্যে সদ্ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া অপরের সম্বন্ধেও শিষ্টাচারী ও সুনীতিপরায়ণ হইবে।

জ্ঞাতিবর্গের সংসর্গলাভ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন করা আবশ্যক। তাঁহাদিগের সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করা, তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে ভোজন করান, রোগে তাঁহাদিগের তত্ত্ব গ্রহণ করা বা সেবাশুশ্রূষা করা, তাঁহাদের বিপদ্ আপনার বিপদ্ মনে করিয়া তাহা হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্যদ্বারা তাঁহাদিগের সংসর্গলাভ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সকলেরই তাহা করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে এদেশের লোকে কুটুম্বকে বড় গৌরবের বস্তু মনে করিত। কুটুম্ব ধনী বা সৎকুলোদ্ভব বা ক্রিয়াবান্, লোকে

মহা আহ্লাদ ও শ্লাঘার সহিত কুটুম্বের এইরূপ পরিচয় দিত। বাড়ীতে কুটুম্ব আসিলে গৃহস্থের আনন্দের সীমা থাকিত না; তাঁহাকে বহুদিবস সেবাশুশ্রূষা ভোজনাদি দ্বারা পরিতুষ্ট না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত না। তিনি যতদিন থাকিতেন ততদিন বাড়ীর স্ত্রী পুরুষ সকলেরই যেন মহোৎসব। কিন্তু এখন আর কুটুম্বের সেরূপ আদর বা গৌরব নাই। এখন লোকে আপন আপন সুখস্বচ্ছন্দের পক্ষপাতী হইয়া কুটুম্বাদির আর আদর যত্ন করে না এবং অর্থলোলুপ হইয়া কুটুম্বের সহিত অতিশয় অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকে। পূর্ব্বে লোকে কুটুম্বের নিকট আদর ও সম্মান খুঁজিত, এখন অর্থ খোঁজে। সেই জন্য অধিক টাকা ও অলঙ্কারাদি না পাইলে লোকে এখন আর পুত্রের বিবাহ দেয় না এবং সামান্য মিষ্টান্ন বা বস্ত্রাদির জন্যও কুটুম্বকে অপমান করে। কুটুম্বের সহিত সদ্ভাব এখন বড়ই কম হইয়া পড়িয়াছে। কুটুম্বের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্থাপন করা কিংবা টাকাকড়ি বা সামান্য দ্রব্য-সামগ্রীর নিমিত্ত তাঁহার সহিত বিবাদ করা বা তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া অতিশয় নীচ প্রকৃতির কাজ। যাহারা কুটুম্বের সহিত নীচ ব্যবহার করিতে পারে তাহারা অপর কাহারও সহিত প্রকৃত উদার ব্যবহার করিতে পারে না। কারণ কুটুম্বের সহিত ব্যবহারেই সমাজের অপর লোকের সহিত ব্যবহারের শিক্ষা ও সূত্রপাত হয়। অতএব পূর্ব্বের ন্যায় কুটুম্বের নিকট কেবল আদর ও সম্মানের প্রত্যাশী হওয়াই উচিত এবং কুটুম্বকে

যথেষ্ট আদর ও সম্মান করা কর্ত্তব্য। এখন কুটুম্বের নিকট টাকাকড়ি প্রত্যাশা করিবার এবং টাকাকড়ি প্রভৃতির নিমিত্ত তাহাকে পীড়ন বা অপমান করিবার যে রীতি অবলম্বিত হইতেছে তাহা যারপর নাই নীচ ও ঘৃণিত বলিয়া পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

কুটুম্ব সকল অবস্থাতেই আদরণীয় ও সম্মানার্হ; অর্থাৎ ধনী হইলেও যেমন, দরিদ্র হইলেও তেমনই আদরণীয় ও সম্মানার্হ। বরং দরিদ্র কুটুম্বকে ধনী কুটুম্বের অপেক্ষা বেশী আদর ও সম্মান করা কর্ত্তব্য। কুটুম্বমাত্রই যখন আদর ও সম্মানের পাত্র, তখন কুটুম্বের মধ্যে ধনী নির্ধনের ইতরবিশেষ করা নীচতার কাজ এবং নীচতার পরিপোষক। মহৎ হইতে হইলে কি কুটুম্ব কি অপর কেহ কাহাকেই ধনী বলিয়া বেশী সম্মান করা বা নির্ধন বলিয়া কম সম্মান করা বা অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নয়।

এদেশের অনেকের আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান এত কম এবং অনেকে এত অলস যে তাহারা আপন আপন চেষ্টায় জীবিকা উপার্জ্জন না করিয়া, জ্ঞাতি বা কুটুম্বের অন্ন ভক্ষণ করিয়া জীবন যাপন করে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা নীচতা ও কাপুরুষতা আর নাই। জ্ঞানিগণ পরের অন্ন ভক্ষণ করাকে কুক্কুরবৃত্তি বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ পরান্নভোজীরা সর্ব্বলোকনিন্দিত ও সর্ব্বলোকঘৃণিত। অধিকন্তু জ্ঞাতি ও কুটুম্বের অন্নে প্রতি-পালিত হইলে জ্ঞাতি ও কুটুম্বের নিকট যারপর নাই হেয় হইয়া

থাকিতে হয়। যে জ্ঞাতি ও কুটুম্বের ভাত খায়, জ্ঞাতি ও কুটুম্ব তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করে এবং সে ঘৃণা তাহাদের ব্যবহারেও কখন কখন প্রকাশ পায়। অতএব কি জ্ঞাতি, কি কুটুম্ব, কি অপর কেহ, কাহারও অন্নে প্রতিপালিত হওয়া ঘৃণাজনক ও লজ্জাকর। পরান্নে প্রতিপালিত হইবার প্রবৃত্তি যাহাতে মনে উদয় না হয় সে বিষয়ে যত্ন করা এবং আপনার চেষ্টায় আপনার পরিশ্রমে আপনার জীবিকা উপার্জ্জন করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

স্বগ্রামবাসী।

—০:০:০—

আমাদের শাস্ত্রে বলে যে জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গের অপেক্ষাও গৌরবের বস্তু। অতএব যে গ্রামে যাঁহার জন্ম তাঁহার পক্ষে সে গ্রাম বড়ই আদর ও গৌরবের বস্তু হওয়া উচিত। সকলেরই আপন আপন গ্রামের মঙ্গল সাধনে প্রাণপণে যত্ন করা কর্ত্তব্য। গ্রামের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা গ্রামের অপর সকল লোককে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিবেন। তজ্জন্য তাঁহাদের গ্রামে স্কুল পাঠশালা স্থাপন ও রক্ষা করা আবশ্যক। গ্রামের মধ্যে যাঁহারা ধনবান্ বা সঙ্গতিশালী তাঁহাদের উচিত যে, গ্রামের লোকের যে সকল অভাব থাকে তাহা মোচন করেন

এবং গ্রামের সুখস্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যে সকল অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন তাহা সম্পন্ন করেন। গ্রামে বিদ্যালয়ের অভাব হইলে অর্থ দিয়া তাঁহাদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যেক গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থের বা ধনবান্ ব্যক্তির বাটীতে পাঠশালা থাকিত। তথায় গ্রামের সমস্ত ছেলে অবস্থাভেদে বিনা বেতনে বা অতি অল্প বেতনে লেখাপড়া করিত। এইরূপ পাঠশালা স্থাপন করা তাঁহারা অবশ্যকর্ত্তব্য অনুষ্ঠান বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাঁহাদের এই সৎকার্য্য যথার্থই অনুকরণীয়। পূর্ব্বে ধনবান্ ও সম্পন্ন ব্যক্তিরা গ্রামের লোকের জলকষ্ট মোচন করিবার নিমিত্ত পুষ্করিণী খনন করা পরম কর্ত্তব্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মানুষ্ঠান মনে করিতেন। এখন এ দেশে অনেক গ্রামে অতিশয় জলকষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বের পুষ্করিণী সকল বুজিয়া যাওয়ায় এবং মধ্যে মধ্যে পরিষ্কৃত না হওয়ায় এই জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। দূষিত জল পান করিবার দরুণ সকল গ্রামেই এখন পূর্ব্বাপেক্ষা পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই জলকষ্ট নিবারণ করা গ্রামের সঙ্গতিশালী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। স্বগ্রামবাসীদিগের নিমিত্ত উত্তম পানীয় জলের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে রোগশোক হইতে মুক্ত করা অপেক্ষা সম্পন্নজনের সম্পত্তির ও ধনবানের ধনের আর নীতিধর্ম্ম-অনুমোদিত ব্যবহার হইতে পারে না। ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়া গ্রামবাসীদিগের এই উপকার টুকু না করা মহাপাপ। এমন অনেক ধনী লোক আছেন যাঁহারা

বৃথা আমোদ আহ্লাদে বা অনাবশ্যক দানে বহু অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বগ্রামবাসীদিগের বিষম জলকষ্ট নিবারণার্থ একটি কপর্দ্দক ব্যয় করাও কর্ত্তব্য মনে করেন না। তোমরা তাঁহাদিগের ন্যায় হইও না। যদি ধনোপার্জ্জন করিতে পার, তবে গ্রামের জলকষ্ট মোচনকরণার্থ কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করাইয়া দিও। জলকষ্ট নিবারণকরণার্থ গ্রামের শিক্ষিত লোকে আর একটি সহজ উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। বিবাহাদি উপলক্ষে অনেক গ্রামে বারয়ারি পূজা প্রভৃতির চাঁদাস্বরূপ অনেক টাকা উঠে। সে টাকা এখন গ্রামের দলপতিদিগের হাতে থাকে। গ্রামের শিক্ষিত লোকদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা সে টাকা আর বৃথা নষ্ট করিতে না দেন। কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়া সকলকে সদ্‌বুদ্ধি দিয়া সম্মত করিয়া সেই টাকা দ্বারা গ্রামের লোকের ব্যবহারার্থ ভাল পুষ্করিণী খনন করা এবং সময়ে সময়ে তাহার পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতি পরিষ্করণ কার্য্য সম্পন্ন করা তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। গ্রামে চিকিৎসালয় স্থাপন করা বা যখন পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় তখন ঔষধ বিতরণ করা ধনাঢ্য ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিদের আর একটি প্রধান কর্ত্তব্য।

এখন কোন গ্রামে মারিভয় বা পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইলে তথাকার লোকে প্রায়ই গবর্ণমেণ্টের নিকট ঔষধ ও চিকিৎসক প্রার্থনা করিয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকারের সমস্ত প্রার্থনা অনুসারে কার্য্য করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অসম্ভব। এরূপ মারিভয় বা পীড়াধিক্য উপস্থিত হইলে গ্রামের বা নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের

ধনবান্ বা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিদিগের নিজ ব্যয়ে ঔষধ ও চিকিৎসকের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত। গ্রামে সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির অভাব হইলে সমস্ত গ্রামবাসীদিগের একত্র হইয়া বিবাহাদি উপলক্ষে প্রাপ্ত টাকা দ্বারা অথবা চাঁদা করিয়া কিছু টাকা তুলিয়া তদ্দ্বারা ঔষধাদি সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

গ্রামের শিক্ষিত ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরা আরও নানা প্রকারে গ্রামবাসীদিগের উপকার বা মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। অনেক গ্রামে এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় যাইবার ভাল পথ থাকে না এবং থাকিলেও সংস্কারাভাবে তাহা অব্যবহার্য্য হইয়া থাকে। তাঁহারা ভাল পথ করিয়া দিয়া বা পথ মেরামত করাইয়া দিয়া গ্রামবাসীদিগের বিশেষ উপকার সাধন করিতে পারেন। এরূপ পথ প্রস্তুত বা সংস্কার করিতে অধিক অর্থব্যয় হয় না। অনেক স্থলে দুইচারি টাকা ব্যয় করিয়া কয়েক ঝোড়া মাটী ফেলাইয়া দিলেই পথ ঠিক হইয়া যায়। বর্ষাকালে গ্রামের মধ্যে স্থানে স্থানে জল জমিয়া গ্রামবাসীদিগের গমনাগমনেরও অসুবিধা উৎপাদন করে এবং স্বাস্থ্যেরও হানি করে। টাকাটা সিকিটা খরচ করিয়া নালা কাটিয়া সেই জল সরাইয়া বা বাহির করাইয়া দিলে গ্রামবাসীদিগের বিশেষ উপকার হয়। শিক্ষিত ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরা এইরূপ নানা কার্য্য দ্বারা আপন আপন গ্রামের মঙ্গল সাধন করিতে পারেন।

গ্রামবাসীদিগের মধ্যে বিষয়সম্পত্তি লইয়া বা অপর কারণে বিবাদ উপস্থিত হইলে যাঁহারা শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ ও সম্ভ্রান্ত

তাঁহাদের তাহা মিটাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সকল বিবাদ নানা অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে। এই সকল বিবাদ আদালতে গেলে বিবাদিগণের বিস্তর অর্থ নষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে চিরশত্রুতা দাঁড়াইয়া যায়, গ্রমের লোকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে শেখে ও মোকদ্দমাপ্রিয় বা মামলাবাজ হয়। এই সকল বিবাদ হইতে দলাদলি উপস্থিত হইয়া গ্রামবাসিগণের মধ্যে দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, নির্য্যাতনস্পৃহা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়া গ্রাম ছারখার হইয়া যায়। গ্রামকে এই সকল বিষম অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং গ্রামবাসিগণের মধ্যে প্রীতি, সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ বর্দ্ধনার্থ শিক্ষিত বুদ্ধিমান্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রেরই প্রাণপণে এই সকল বিবাদ নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

গ্রামের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, তাঁতি প্রভৃতি নানা জাতি এবং ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত প্রভৃতি নানা অবস্থার লোক বাস করে। পূর্ব্বে এই সমস্ত জাতি ও অবস্থার লোকের মধ্যে অপূর্ব্ব প্রীতি ও সদ্ভাব দেখা যাইত। গ্রামের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেও বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। গ্রামের মধ্যে যিনি ধনে বা জাত্যংশে প্রধান তিনিই কৃষক, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, বাগ্দী, দুলে প্রভৃতি দরিদ্র বা নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকেও যথেষ্ট আদর-যত্ন করিতেন; চণ্ডীমণ্ডপে বা বৈঠকখানায় তাহাদিগকে লইয়া বসিয়া তাহাদিগের সহিত নানা বিষয়ে মন খুলিয়া ও জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া মিষ্টালাপ করিতেন। গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরা কোন কৃষককে দাদা বলিতেন, কোন কর্ম্মকারকে খুড়া বলিতেন,

কোন বাগ্দীকে ভাইপো বলিতেন। ইহাতে সমস্ত গ্রামবাসী যেন একটি পরিবাররূপে প্রতীয়মান হইত। অনেক গৃহকর্ত্তা এবং গৃহিণী, গ্রামের যে সকল দরিদ্রের আহার জুটিত না তাহাদিগকে অন্নদান না করিয়া আপনারা ভোজন করিতেন না। কাঙ্গালিনী ভোজনপাত্র হস্তে লইয়া মধ্যাহ্নকালে গৃহস্থের রন্ধনশালার সম্মুখে দাঁড়ালেই অন্নব্যঞ্জন পাইত। এই সকল কারণে গ্রামে সর্ব্বদাই অপূর্ব্ব সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ বিরাজ করিত। গ্রামের শ্রেষ্ঠেরা নিকৃষ্টদিগকে স্নেহ ও যত্ন করিতেন এবং নিকৃষ্টেরা শ্রেষ্ঠদিগকে ভক্তি ও সম্মান করিত। ইহার একটি সুন্দর ফল এই হইত যে গ্রামের ধনাঢ্য ও উচ্চবংশীয়েরা এখনকার ধনাঢ্য ও উচ্চবংশীয়দের ন্যায় দাম্ভিক হইতেন না এবং গ্রামের দরিদ্র ও নিম্নবংশীয়দিগকে ঘৃণা বা তুচ্ছ করিতেন না এবং গ্রামের দরিদ্র বা নিম্নবংশীয়েরা এখনকার দরিদ্র বা নিম্নবংশীয়দিগের ন্যায় অশিষ্ট, অবিনয়ী ও স্পর্দ্ধাবান্ হইত না এবং গ্রামের ধনাঢ্য বা উচ্চবংশীয়দিগের প্রতি হতশ্রদ্ধ হইত না। উচ্চশ্রেণীর লোকের আদর-যত্নে ও সঙ্গগুণে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উচ্চশ্রেণীর লোকের শিষ্টতা, সদাচার, এমন কি কিছু কিছু বিজ্ঞতাও প্রাপ্ত হইত। হুগলী জেলার একখানি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থের বাটীতে দুর্গোৎসবের সময় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকের মজ্‌লিসে একখানি ক্ষুদ্র মলিন বস্ত্রপরিহিত একটি অশীতিবর্ষীয় খর্ব্বাকার কর্ম্মকার সর্ব্বাগ্রে হুঁকা

প্রাপ্ত হইতেন এবং অপূর্ব্ব শিষ্টতায় ও অসাধারণ বাক্পটুতায় সমস্ত মজ্‌লিসটিকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। গ্রামের উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণীকে এইরূপ আদর-যত্ন করায় তখন গ্রামের নিম্ন-শ্রেণীতে সুরাপান প্রভৃতি দোষ এবং এখনকার মত এত বেশী মামলা মোকদ্দমা ছিল না। নিম্নশ্রেণীর লোক উচ্চশ্রেণীর সঙ্গগুণে এবং তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান্ বলিয়া সুরাপান প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম বড় বেশী করিত না এবং করিতে সাহসী হইত না এবং বিবাদবিসম্বাদ উপস্থিত হইলে আদালতে না গিয়া উচ্চশ্রেণীর দ্বারা তাহা মিটাইয়া লইত। ইহাতে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে নীতি-ধর্ম্মের উন্নতি হইত। এখনকার অনেক শিক্ষিত পুরুষ ও স্ত্রী গ্রামবাসী ও গ্রামবাসিনীদিগের সহিত সেরূপ ব্যবহার করেন না। তজ্জন্য অনেক গ্রামে লোকে এখন আর পূর্ব্বের মত এক পরিবারের ন্যায় থাকে না। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আর সে সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ নাই। উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণীকে আর তেমন আদর-যত্ন করেন না; নিম্নশ্রেণীও উচ্চশ্রেণীকে আর তেমন ভক্তিশ্রদ্ধা করে না। সেই জন্য এখন গ্রামবাসীদিগের মধ্যে দলাদলি বৃদ্ধি হইয়াছে, গ্রামবাসীরা পরস্পরকে হিংসা দ্বেষ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শিক্ষিত লোকের পক্ষে ইহা বড় লজ্জার কথা। সকল শিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষই যেন পূর্ব্বের ন্যায় জাত্যভিমান, ধনগর্ব্ব প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কি ছোট কি বড়, কি উচ্চবংশীয় কি নিম্নবংশীয়, সকল গ্রামবাসী ও গ্রাম-বাসিনীকে আপনার ভাবিয়া পাত্র-পাত্রীভেদে ভক্তিশ্রদ্ধা ও

আদর-যত্ন করেন এবং সাধ্যানুসারে তাহাদের মঙ্গল সাধন করিবার চেষ্টা করেন।

সর্ব্বসাধারণের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য।

—•:*:•—

যাহাদিগের সহিত জ্ঞাতিত্বসূত্রে বা কুটুম্বত্বসূত্রে বা এক-গ্রামে বাস করা সূত্রে কোন সম্পর্ক নাই, তাহাদিগের সম্বন্ধেও কতকগুলি গুরুতর কর্ত্তব্য আছে। নিরতিশয় যত্নসহকারে সে কর্ত্তব্যগুলি পালন করিবে। কর্ত্তব্যগুলি এই ঃ—

যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁহাদিগকে সম্মান করিতে হয়। তাঁহাদিগের নিকট বিনীত আচরণ আবশ্যক, ঔদ্ধত্য বা বাচালতা যারপরনাই দূষণীয়। এখন অনেক বালক ও যুবককে এই নিয়মটি ভঙ্গ করিতে দেখা যায়। তাহারা বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে যেন ভ্রূক্ষেপ করে না; তাঁহাদের সম্মুখে গোলমাল করে, উচ্চহাস্য করে, উদ্ধতভাবে চলাফেরা করে, ইত্যাদি। এমন কি, সভাসমিতিতেও তাহারা অনেক সময় জ্যেষ্ঠদিগের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করে না। এরূপ আচরণ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। বিনয় ও শিষ্টাচারের ন্যায় সৌন্দর্য্য আর নাই। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি নিম্নশ্রেণীর লোক হইলেও, তাঁহাকে ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়, সম্মান ও আদর করা কর্ত্তব্য। এবং বয়োজ্যেষ্ঠ-

দিগকেও যেমন বয়োজ্যেষ্ঠাদিগকেও তেমনই জাতিকুলনির্ব্বিবশেষে সম্মান করিতে হয়। অর্থাৎ গৃহে যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠা তাঁহাদিগকে যেমন সম্মান করা উচিত, গৃহের বাহিরে যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠা তাঁহাদিগকেও তেমনই সম্মান করা উচিত। কর্ত্তব্য পালনে আপন পর ভেদ নাই, আপন পর ভেদ করিতেও নাই। কর্ত্তব্য পালনে আপন পর ভেদ না করাই উৎকৃষ্ট নীতি। এই নীতি অনুসরণে সাধ্যানুসারে যত্নবান্ হইও। বয়সে যাহারা কনিষ্ঠ তাহাদিগের সহিত আপন পর ও জাতিকুলনির্ব্বিবশেষে সাদর ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁহাদিগকে যেমন সম্মান করিতে হয় এবং তাঁহাদিগের নিকট যেমন বিনীত ও শিষ্টাচারী হইতে হয়, যাঁহারা শ্রেষ্ঠপদের অধিকারী তাঁহাদিগকেও তেমনই সম্মান করিতে হয় এবং তাঁহাদিগের নিকটও তেমনই বিনীত ও শিষ্টাচারী হইতে হয়। যিনি শ্রেষ্ঠপদের অধিকারী, প্রাণপণে তাঁহার আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য। তাঁহার আজ্ঞাপালনে ত্রুটী করা বড় দোষ। অপর পক্ষে, তাঁহারও নিম্নপদের অধিকারীকে সম্মান করা ও তাহার সহিত সদয়ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। নিম্নপদের অধিকারী বলিয়া কাহাকেও অপমান বা অবজ্ঞা করা অথবা কাহারও সহিত রূঢ় ব্যবহার করা তাঁহার পক্ষে যারপরনাই নিন্দনীয়।

কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পাপী, কি পুণ্যবান্, কাহাকেও ঘৃণা করিতে নাই। আমাদের

শাস্ত্রে বলে যে, যিনি সকল জীবকে আপনার ন্যায় দেখেন বা জ্ঞান করেন তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। খৃষ্টীয় প্রভৃতি অপরাপর শাস্ত্রেও এইরূপ কথা বলে। অতএব কাহাকেও ঘৃণা করিও না। কেহ কেহ পাপীকে ঘৃণা করেন। কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করা উচিত নয়, পাপকেই ঘৃণা করিতে হয়। যে পাপী তাহাকে দয়া করিতে হয় এবং সে যাহাতে পাপমুক্ত হইতে পারে তদ্বিষয়ে উপদেশাদি দিয়া যত্ন ও চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পাপীকে ঘৃণা করাও পাপ। অনেকে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি দেখিলে নাসিকা বস্ত্রাবৃত করিয়া বা পলায়ন করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি বড়ই করুণার পাত্র। তাহার দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার কথা মনে করিলে বুক ফাটিয়া যায়। তাহার ক্ষত-বিক্ষত শরীর দেখিয়া ঘৃণা অনুভব করা বা প্রকাশ করা মহাপাপ। তাহাকে ঘৃণা করিলে তাহার অতিশয় লজ্জা ও মনঃকষ্ট হয়। ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়াই সে যারপরনাই লজ্জিত ও মর্ম্মপীড়িত। অতএব তাহাকে দেখিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়া তাহার সেই লজ্জা ও মর্ম্মপীড়া বৃদ্ধি করার ন্যায় মহাপাতক কি আর আছে? ফল কথা, কি ব্যাধিগ্রস্ত, কি ব্যাধিশূন্য, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি বালিকা, কি বৃদ্ধা, কি ধনবান্, কি দরিদ্র, কি উচ্চবংশীয়, কি নীচবংশীয়, কাহাকেও কোন রকমে কিছুমাত্র মনঃকষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

ধর্ম্ম বা আচারব্যবহার সম্বন্ধীয় প্রভেদ লইয়া কাহাকেও ঘৃণা করা অন্যায়। অনেক হিন্দু খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতিকে

বিধর্ম্মী বা অনাচারী বলিয়া ঘৃণা করেন। অনেক খৃষ্টান হিন্দুকে কুসংস্কারাপন্ন পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করেন। অনেক মুসলমান হিন্দু ও খৃষ্টান প্রভৃতি বিধর্ম্মীকে কাফের বলিয়া ঘৃণা করেন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পরস্পরকে এই রূপে ঘৃণা করা মহাপাপ। কোন ধর্ম্মই বিধর্ম্মীকে বা বিভিন্নাচারীকে ঘৃণা করিতে উপদেশ দেয় না।

আমাদের শাস্ত্রে বলে যে, মানুষ যে প্রণালীতেই ঈশ্বরের পূজা করুক না, ভক্তিভাবে পূজা করিলে ঈশ্বর তাহার পূজা গ্রহণ করেন। আমাদিগের ইংরাজ রাজাও বিধর্ম্মীর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না, বিধর্ম্মীকে ঘৃণা বা বিদ্বেষ করেন না। অতএব আমাদের শাস্ত্র ও রাজচরিত উভয়েই আমাদিগকে বিধর্ম্মীকে বিধর্ম্মী বা বিভিন্নাচারী বলিয়া ঘৃণা করিতে নিষেধ করিতেছে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর ও বিভিন্ন দেশবাসীর আচার ব্যবহার বিভিন্ন হইয়াই থাকে। আমাদের শাস্ত্রও সেই কথা বলে এবং বিধর্ম্মীর বিভিন্নাচারের নিন্দা করে না। অতএব স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী নির্ব্বিশেষে সকলকে সমান সম্মান ও প্রীতি করিও। বিধর্ম্মী বলিয়া কাহাকেও বাক্য দ্বারা বা কার্য্য দ্বারা মনঃকষ্ট দিও না।

পরোপকার সকল শাস্ত্রেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই সাধ্যমত পরোপকার করা কর্ত্তব্য। স্বগ্রামবাসীদিগের উপকার করিবার কথা বলা হইয়াছে। স্বগ্রামবাসীদিগের উপকার করিতে হইবে বলিয়া

অপর কাহারও উপকার করিতে হইবে না, তাহা নয়। স্বগ্রাম-বাসীদিগের উপকার করিবার পর যদি অপরের উপকার করিবার আর্থিক সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে অপরের উপকার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু অর্থব্যয় না করিয়াও পরোপকার করিতে পারা যায়। কোন ব্যক্তি জলে ডুবিতেছে, বিনা অর্থব্যয়ে তাহার প্রাণরক্ষা করা যাইতে পারে। কোন গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে, জলসেক দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া গৃহস্থকে বা তাহার সম্পত্তি রক্ষা করিতে অর্থব্যয় অনাবশ্যক। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অর্থব্যয় না করিয়াও নানাপ্রকারে লোকের উপকার করা যাইতে পারে। যাহাদের অর্থাভাব তাঁহারা যদি এই প্রকারে পরোপকার না করেন তাহা হইলে তাঁহাদের পাপ হয়। কিন্তু এই প্রকারে পরোপকার করিতে শারীরিক বল, কার্য্যতৎপরতা, সাহস বা নির্ভীকতা প্রভৃতি কতকগুলি গুণ আবশ্যক। বাল্যকাল হইতে এই সকল গুণ লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত এবং সন্তানাদি যাহাতে এই সকল গুণের অধিকারী হইতে পারে তজ্জন্য পিতামাতার বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক।

পরোপকার যে প্রকারেই করা যাউক, উহা জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে না করিলে পাপ হয়। কেহ কেহ স্বধর্ম্মী ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেন, বিধর্ম্মী ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেন না, অথবা বিধর্ম্মী ভিক্ষুককে স্বধর্ম্মী ভিক্ষুকের অপেক্ষা কম ভিক্ষা দেন। কেহ কেহ স্বজাতীয়ের উপকার করেন, ভিন্ন জাতীয়ের উপকার করেন

না। পরোপকারে এরূপ জাতিধর্ম্মের বিচার করা যারপরনাই দূষণীয়। আমাদের পূজা প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ভিক্ষাদান করা হয়। পরোপকারের ইহাই প্রশস্ত নীতি। এই নীতি অনুসরণ করিতে ক্রটী করিও না

মানুষের শুধু মানুষের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য আছে তাহা নয়। পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির সম্বন্ধেও কর্ত্তব্য আছে। "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ" অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতকে আপনার ন্যায় দেখেন তিনিই পণ্ডিত। ইহাতে যে ভূত শব্দ আছে তাহাতে কেবল মানুষ বুঝায় না, পশু-পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী বুঝায়। পশু-পক্ষী প্রভৃতিকেও দয়া করা কর্ত্তব্য। যে সকল প্রাণী আমাদের কোন অনিষ্ট করে না, তাহাদিগকে অনর্থক ধ্বংস করা বা ক্লেশ দেওয়া ঘোর নিষ্ঠুরতা ও অধর্ম্ম। অনেক বালক পক্ষীর বাসা হইতে পক্ষিশাবক অপহরণ করিয়া, ভেকের গায় ঢিল মারিয়া, ফড়িঙের ডানা ছিঁড়িয়া, বিড়ালের গলায় দড়ি বাঁধিয়া হিড়্‌হিড়্‌ করিয়া টানিয়া এবং আরও অনেক প্রকারে পশু-পক্ষী প্রভৃতিকে অতিশয় যন্ত্রণা দেয়। এরূপ ক্রীড়া যারপরনাই নৃশংস ও দূষণীয়। কখনও কাহাকে এরকম খেলা খেলিতে দিও না। কৃষক প্রভৃতি শ্রম-জীবীরা গো-মহিষাদিকে খাটাইবার সময় তাহাদিগকে অতিরিক্ত প্রহার করিয়া বা ভার টানিতে দিয়া বড়ই কষ্ট দেয়। শ্রম-জীবীরা যাহাতে গবাদির প্রতি সদয় ব্যবহার করে, শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই তাহাদিগকে উপদেশাদি দিয়া সেই চেষ্টা করা

কর্ত্তব্য। আমাদের শাস্ত্রে অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ কোন প্রাণীকে বিনাশ না করা এবং বেদনা না দেওয়া অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। এমন সুন্দর ও উচ্চ উপদেশ আর হইতে পারে না। স্ত্রী পুরুষ সকলেরই এই উপদেশ পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

চিত্র-চয়ন।

[১]

বঙ্গের একটি জেলায় কৌশিকী নদী প্রবাহিতা। নদীটি ক্ষুদ্র। দেখিতে যেন একছড়া রূপার হার। নদীর দুই কূলে শস্যক্ষেত্র, আম্রকানন ও প্রাচীন জনপূর্ণ পল্লীগ্রাম। পল্লী-বাসিনীরা নদীর জলে বাসন মাজে, স্নান করে, সন্ধ্যার প্রাকালে আগ্রীবনিমজ্জিতা হইয়া সুখ ও সংসারের কথা কয়। নদীতে প্রচুর মৎস্য, পল্লীবাসীরা মনের সাধে মাছ খায়। কৃষকেরা নদীর জলে আপন আপন ক্ষেত্রে সোনা ফলায়। শুনা যায় কৌশিকী-ধৌত জনপদে "অকাল অজন্মা" ছিল না।

কৌশিকী-তীরে গ্রাম। গ্রামখানি প্রাচীন এবং বহুসংখ্যক ভদ্রলোকের বাসস্থান। গ্রামের একস্থানে কৌশিকীর ধারে একটি বৃহৎ আম্রকানন। সেই আম্রকাননে ঘোষ মহাশয়দিগের বাড়ী। বাড়ী সাত কি আট অংশে বিভক্ত। এক অংশের কর্ত্তা লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ। লক্ষ্মীকান্তের পাঁচ সহোদর। তাঁহার



গৃহে লোক ধরে না,—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, ভাইপো আছেই ত, কিন্তু আরো যে কত আছে, তাহা বলিতে পারি না। আহা, জ্ঞাতি কুটুম্বের মধ্যে স্ত্রী বল, পুরুষ বল, যে যেখানে নিরন্ন নিরাশ্রয় হইয়াছে, সেই তাঁহার গৃহে পুত্র-কন্যা অপেক্ষা প্রিয়, গৃহ-দেবতা অপেক্ষা সমাদৃত, গুরুদেব অপেক্ষা সম্মানিত। তাঁহার বেশভূষা নাই—তাঁহার পায়ে একটি জোড়া খড়ম, পরিধানে একখানি থান কাপড়, স্কন্ধে একখানি উত্তরীয়। তাঁহার ভোগবিলাস নাই—তিনি গাড়ী ঘোড়া কখনও চক্ষে দেখেন নাই, আতর গোলাপের নাম শুনিয়াছেন মাত্র; ভোজন করেন আশ্রিত অনাথ অনাথারা যা তাই, তাহার চেয়ে মন্দ ত ভাল নয়। তাঁহার বিষয় সম্পত্তির ভাবনা নাই—তাঁহার একমাত্র ভাবনা, কিসে তাঁহার সেই অন্নের কাঙ্গালগুলি অন্ন পাইবে। তিনি সকলের পেটের জ্বালা বুঝেন, কিন্তু তাঁহার আপনার পেটের জ্বালা নাই। বেলা দুই প্রহর হইয়াছে তখনও তিনি আহার করেন নাই, কেন না তখনও তিনি অনুসন্ধান করিতেছেন, পাড়ার হাড়ি মুচি কৈবর্ত্তের মধ্যে কেহ অভুক্ত আছে কিনা। যাহার অন্ন জুটে নাই, তাহাকে অন্ন দিয়া তবে আপনি বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় স্বয়ং একমুঠা ভক্ষণ করেন। লক্ষ্মীকান্ত অন্নবিতরণে মুক্ত-হস্ত।

[২]

আর সেই মেজকাকীর কথা মনে পড়ে কি? তিনি গ্রামের সকলেরই মেজকাকী। তাঁহার বয়স চল্লিশের কিছু বেশী, বর্ণ

কাঞ্চনের ন্যায়, গঠন পাতলা ছিপ্‌ছিপে। মেজকাকী গৃহের মধ্যে একজন গৃহিণী; কিন্তু অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী, ছেলেপুলেরাও তাঁহার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে পায় না। মেজকাকীর গলা নাই, তিনি আস্তে আস্তে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া কথা ক'ন। তাঁহার ছেলে-পুলে নাই—ঝাড়া হাত পা, কিন্তু তাঁহার ঘরে ছেলে, ধরে না। ঘোষেদের ছেলে, মিত্রদের ছেলে, সরকারদের ছেলে, গ্রামের সকলের ছেলেমেয়ে তাঁহার ঘরে—তাঁহার ঘরে সদাই ছেলের হাট। তিনি কোন ছেলেকে খাওয়াইতেছেন, কোন ছেলেকে পরাইতেছেন, কোন ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেছেন, কোন ছেলের গা মুছাইয়া দিতেছেন। তিনি উপর হইতে নীচে যাইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সাতটা ছেলে যাইতেছে; নীচে হইতে উপরে আসিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সাতটা ছেলে আসিতেছে; তিনি ঠাকুর প্রণাম করিতেছেন, তাঁহার এ পাশে ও পাশে ছেলের পাল 'ও ঠাকুল বাল কল' বলিয়া ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করিয়া প্রণাম করিতেছে। রাত্রি এক প্রহর, তখনও মেজকাকীর ঘরে পাঁচটা ছেলে। মেজকাকী তাহাদিগকে দুধ খাওয়াইয়া গুণ্‌গুণ্‌ স্বরে গান গাহিয়া ঘুম পাড়াইলেন, ছেলেদের মায়েরা আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া গেল। একটি ছেলে মেজকাকীর ঘরেই রহিল। সে ছেলেটা বড় দুরন্ত এবং তাহার মার আর পাঁচটি ছেলে আছে। তাহার মা তাহাকে মেজকাকীর কাছে রাখিয়া বাঁচিল। মেজকাকীর একটি পয়সা খরচের দরকার নাই। কিন্তু খেলনায় ও সন্দেশ মিঠাই খৈ বাতাসায় তাঁহার মাসে পনর

ষোল টাকা ব্যয় হয়। মেজকাকীর ঝাড়া হাত পা, কিন্তু দিবা-রাত্রের মধ্যে তাঁহার অবকাশ নাই। মেজকাকী জগদ্ধাত্রী, যাহার ধাত্রীর আবশ্যক সেই তাঁহার কাছে আসে। তিনি অন্নপূর্ণা—স্নেহের ভিখারী শিশুকে তিনি সদাই স্নেহসুধা পান করান।

[৩]

রঘুনাথ দিব্য জোয়ান পুরুষ—বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশ। রঘুনাথ অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল। তোমার বাড়ীতে আজ একটি বৃহৎ ক্রিয়া; তোমার লোকবল নাই। রঘুনাথ আসিয়া তোমার জিনিষ পত্র ক্রয় করিয়া দিল, ঘর বাড়ী পরিষ্কার করাইয়া দিল, চালা চুল্লী প্রস্তুত করাইয়া দিল, লোকজন খাওয়াইয়া দিল। দশ দিন ধরিয়া রঘুনাথ এই সব করিল। তুমি রঘুনাথকে আশীর্ব্বাদ করিলে, রঘুনাথ তোমাকে নমস্কার করিয়া গিয়া তাহার পরদিন হইতে আবার ঐ সিংহ মহাশয়ের কন্যার বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। রঘুনাথ চিরকালই এইরূপ করে—শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, অহঙ্কার নাই, অভিমান নাই। রঘুনাথকে কি কখনও দেখ নাই? ঐ যে মিত্র মহাশয়ের মাতৃ-শ্রাদ্ধে ঐ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সহস্রাধিক লোক এক সঙ্গে ভোজন করিতে বসিয়াছে—আর ঐ যে বর্ষীয়ান্, দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ পুরুষ কোমরে গামছা বাঁধিয়া পৌষ মাসের দারুণ শীতে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে অসুরবিক্রমে ঐ সহস্রাধিক ভোক্তাকে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিতেছেন—উনিই রঘুনাথ। আবার মিত্র মহাশয়ের অন্তঃপুরে যাও, সেখানে রঘুনাথের মাকে দেখিবে—তিনিও

রঘুনাথেরই মত। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান করিয়া তিনি রন্ধন আরম্ভ করিয়াছেন। দ্বাদশটা চুল্লী জ্বলিতেছে, রঘুনাথের মা রন্ধন করিতেছেন। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, এখনও রন্ধন করিতেছেন। কোমরে অঞ্চল জড়ান, মস্তকোপরি কেশ চূড়ার আকারে বাঁধা, মুখ রক্তবর্ণ, শরীর ঘর্ম্মাক্ত—এখনও রঘুনাথের মা অসীম উৎসাহে রন্ধন করিতেছেন। মিত্রবাড়ীর গৃহিণী বারবার বলিতেছেন 'রঘুর মা, এক ফোঁটা চিনির পানা গলায় দিয়া যাও।' রঘুর মা এখন উন্মাদিনী, সে কথায় তাঁহার কাণ নাই। যেমনি মা, তেমনি পুত্র!

দিবাভাগে কেহ রঘুনাথকে তাঁহার নিজ বাটীতে দেখিতে পায় না। পূর্ব্বাহ্নে হউক, অপরাহ্নে হউক, যখনই হউক রঘুনাথের বাড়ীতে গিয়া রঘুনাথকে ডাকিলে, রঘুনাথের সাড়াশব্দ পাইলে না। আবার ডাকিলে, একটি ছেলে আসিয়া বলিল—বাবা বাড়ীতে নাই, ঘোষেদের বাড়ীতে আছেন। ঘোষেদের বাড়ীতে গিয়া দেখিলে রঘুনাথ ভিয়ানশালায় ভোক্তার সংখ্যা ধরিয়া মিষ্টান্নের পরিমাণ ঠিক করিতেছেন। রঘুনাথ কখন একবার বাড়ীতে আসিয়া চারিটী ভাত খাইয়া যান, কেহ জানিতে পারে না। রাত্রিকালে তাঁহার নিদ্রা বড় কম। যে নিদ্রাটুকু হয়, তাহাও কাক-নিদ্রাবৎ; একটা টিকৃটিকির শব্দে সে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। নিদ্রাতেও তাঁহার কর্ণ চারিদিকে। রাত্রি ঘোর অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপ্‌টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে।

রঘুনাথ ঘুমাইয়াও জাগ্রত! রোদনধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন, অনাথা হরসুন্দরীর পুত্রটি প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অমনি শয্যা হইতে উঠিয়া আপনার ন্যায় আরো দুই তিন জনকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া, মৃত পুত্রটির সৎকার করিয়া আসিলেন! বাস্তবিক রঘুনাথ দেবতা।

ব্রহ্মচর্য্য।

—•:*:•—

[ছাত্রের কর্ত্তব্য]

পাঠদ্দশা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বলিয়া অভিহিত হয়। জীবনের প্রারম্ভ কালই সমস্ত জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। বৃক্ষ সম্বন্ধে যেমন বৃক্ষমূল, জীবন সম্বন্ধে তেমনি জীবনের প্রারম্ভ। অতএব বাল্যে যে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা আছে, তাহারই কথা কিছু বিস্তৃত ভাবে কহা যাউক।

শিক্ষা কাহাকে বলে বুঝিতে হইলে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়—শিক্ষার বিষয় এবং শিক্ষার নিয়ম।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার বিষয়।

হিন্দু-শাস্ত্রমতে শিক্ষার বিষয় চারিটি—দেহ, মন, আত্মা এবং হৃদয়।

ক। দেহের শিক্ষা।

ব্রহ্মচারী অথবা ছাত্রের দেহ সুস্থ এবং বলিষ্ঠ রাখিবার নিমিত্ত মনুসংহিতায় কতকগুলি ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা ঃ—

(১) ব্রহ্মচারীর শয়নাবস্থায় সূর্য্য উদিত বা অস্তমিত হওয়া অতিশয় দোষাবহ।

(২) গুরু শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই শিষ্যকে শয্যা হইতে উঠিতে হইবে এবং গুরুর শয়ন করিবার পর শয়ন করিতে হইবে।

(৩) শ্রমশীল হইয়া দূর হইতে যজ্ঞকাষ্ঠ আনিয়া তাহা রৌদ্রে শুকাইবে এবং তদ্দারা প্রাতে ও সায়ংকালে অগ্নিতে হোম করিবে।

(৪) জলকলস, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা, কুশ প্রভৃতি আচার্য্যের তাবৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ করিবে এবং প্রতিদিন ভৈক্ষচর্য্যা করিবে।

প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠা, দূর পথ ভ্রমণ ও শারীরিক পরিশ্রম স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কত আবশ্যক তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। মনুও ব্রহ্মচারীর নিমিত্ত সেইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন।

খ। মনের শিক্ষা।

মানসিক শিক্ষার নিমিত্ত বেদাদিগ্রন্থ পড়ান হইত। গুরু শিষ্যকে অতি উৎকৃষ্ট শাস্ত্র সকল শিখাইতেন এবং যাহা শিখাইতেন তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া শিখাইতেন। মনু বলেন ঃ—

ব্রহ্মচারী তিন বেদ শিক্ষার নিমিত্ত ছত্রিশ বৎসর এবং

আবশ্যক হইলে ততোধিক কাল, অথবা তাহার অর্দ্ধ কাল কিংবা তাহার এক চতুর্থাংশ কাল, গুরুকুলে বাস করিবে। এইরূপে নিজ বেদশাখা শিক্ষা করিবে।

গ। আত্মার শিক্ষা।

আত্মার শিক্ষাও প্রাচীন প্রণালীর প্রধান অঙ্গ ছিল। ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে মনুর ব্যবস্থা এই :—

(১) নিত্য স্নান করিবে, পবিত্র দেহে ও পবিত্র মনে দেব, ঋষি ও পিতৃলোকের তর্পণ ও অর্চ্চনা করিবে এবং কাষ্ঠাহরণপূর্ব্বক হোমকার্য্য করিবে।

(২) আচমনপূর্ব্বক পবিত্র ভাবে ও অভিনিবিষ্টচিত্তে পবিত্রস্থানে বসিয়া দুই সন্ধ্যা সাবিত্রীর উপাসনা করিবে।

ঘ। হৃদয়ের শিক্ষা।

হৃদয়ের শিক্ষা সম্বন্ধেও অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—

(১) মাতাপিতা পুত্রের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করেন, সাধ্য কি যে পুত্র শত শত বর্ষেও সে ধার শুধিতে পারে? নিত্য সেই পিতামাতার এবং আচার্য্যের প্রিয় কর্ম্ম করিবে, ইঁহারা তুষ্ট হইলে সকল তপস্যা সিদ্ধ হয়। এই তিনজনের শুশ্রূষাই মহাতপস্যা। তাঁহাদের বিনানুমতিতে কোন ধর্ম্মই আচরণ করিবে না।

(২) যিনি অল্পই হউক বা বহুই হউক ব্রহ্মচর্য্যার সাহায্য করেন, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে গুরুবৎ পূজা করিবে।

(৩) যিনি ব্রহ্মচারী, তাঁহার জীবহিংসা অকর্ত্তব্য।

শিক্ষার বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্য।

উদ্ধৃত বাক্যসমূহ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মচারী বা ছাত্রের শিক্ষা চারি প্রকার ছিল—দেহের শিক্ষা, মনের শিক্ষা, হৃদয়ের শিক্ষা এবং আত্মার শিক্ষা। এখন এদেশে ছাত্র কয় প্রকার শিক্ষা পাইয়া থাকে? বোধ হয় এক প্রকার ভিন্ন নয়, অর্থাৎ কেবল মনের শিক্ষা। এখন স্কুল কলেজে ছাত্রের কেবল মাত্র কিঞ্চিৎ বুদ্ধির পরিচালনা হইয়া থাকে এবং ছাত্র কিঞ্চিৎ বিদ্যা উপার্জ্জন করে। হৃদয়ের প্রকৃত শিক্ষা স্কুল কলেজে হওয়া সুকঠিন। পূর্ব্বে যেমন গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যা-ভ্যাস করিবার রীতি ছিল, তাহাতে হৃদয়ের শিক্ষা হইতে পারিত, এখন স্কুল কলেজে যে রকমে বিদ্যাভ্যাস করা হয়, তাহাতে উহা লাভ করা বড় কঠিন। পূর্ব্বে গুরু শিষ্যকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন এবং শিষ্য গুরুকে পিতৃবৎ ভক্তি করিতেন। অর্থাৎ গুরু-শিষ্যের মধ্যে হৃদয়ের একটি গ্রন্থি থাকিত এবং সেইজন্য গুরুর কাছে শিষ্যের হৃদয়ের উত্তম শিক্ষা হইত। এখন স্কুল কলেজে গুরু-শিষ্যের মধ্যে হৃদয়ের গ্রন্থি প্রায়ই থাকে না। কাজেই এখন বালকেরা স্কুল কলেজে হৃদয়ের শিক্ষা পায় না। ঘরে পিতা-মাতা সন্তানকে এ শিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু

তাঁহারা প্রায়ই সন্তানকে স্কুল কলেজে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হন

আত্মার শিক্ষা সম্বন্ধেও এই সকল কথা খাটে। আমাদের স্কুল কলেজে প্রায়ই ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয় না। আর প্রকৃত ধর্ম্ম-শিক্ষা যাহাকে বলে, তাহা বিবেচনা করিলে বোধ হয় একথাও বলা যাইতে পারে যে স্কুল কলেজ প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার স্থান নয়। দুই চারিখানা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িলে ধর্ম্মশিক্ষা হয় না। ধর্ম্মচর্য্যাই প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা। গৃহ, ধর্ম্মচর্য্যার উৎকৃষ্ট স্থান। কিন্তু এখন গৃহে সন্তানের ধর্ম্মচর্য্যার প্রতি পিতা বা পিতৃব্যের মনোযোগ নাই। কাজেই এখন আত্মার শিক্ষার অভাবে আমাদের শিক্ষা যারপরনাই অঙ্গহীন হইতেছে।

শরীরের শিক্ষাও এখন বিশেষ হয় না। পূর্ব্বকালের ন্যায় এখন শিক্ষকের নিমিত্ত জল তুলিবার রীতি নাই, কেন না জল তুলিবার আবশ্যকতা নাই। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ প্রভৃতি যে সকল স্বাস্থ্যকর নিয়ম পালন করা উচিত, তৎপ্রতি আর তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় না। সন্ধ্যাহ্নিকে আস্থা থাকিলে প্রকারান্তরে এই সকল নিয়মের প্রতি লোকের লক্ষ্য থাকিত। কিন্তু সে আস্থাও নাই, সে লক্ষ্যও নাই। স্কুল কলেজে যাইতে এবং স্কুল কলেজ হইতে বাটী আসিতে পথ হাঁটার প্রয়োজন। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, কলিকাতায় লোকে গাড়ী করিয়া বালকদিগকে স্কুল কলেজে পাঠাইতে আজকাল কিছু বেশী ভাল-বাসিতেছেন। মফঃস্বলেও গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হওয়ায়

বালকদিগের পথ হাঁটারূপ হিতকর ব্যায়ামটি উঠিয়া যাইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও এদেশের লোক যে রকম হাঁটিতে পারিত, এখন তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। সে পথহাঁটার কথা এখন গল্প বলিয়া মনে হয়।

অতএব শিক্ষার বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রকৃত ব্রহ্মচারী এখন নাই, পূর্ব্বকালে ছিল ; জীবনের প্রকৃত ভিত্তি এখন স্থাপিত হয় না, পূর্ব্বকালে হইত।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার নিয়ম।

প্রাচীন শিক্ষার নিয়ম কি ছিল, এখন তাহাই বুঝিয়া দেখিতে হইবে। মনু বলেন :—

(১) ব্রহ্মচারী গুরুকুলে থাকিয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক নিজ তপোবৃদ্ধির নিমিত্ত নিয়ম পালনে তৎপর হইবে।

(২) মধু, মাংস, গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি সকল প্রকার বিলাস-দ্রব্য এবং প্রাণিহিংসা পরিত্যাগ করিবে।

(৩) আভাঙ্ করিয়া তৈলাদি মর্দ্দন, নেত্ররঞ্জন, পাদুকা ও ছত্রধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, নৃত্য, গীত, বাদ্য—এই সকল পরিত্যাগ করিবে।

(৪) ব্রহ্মচারী একজনের অন্নে জীবন ধারণ করিবে না, ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

(৫) গুরুসমীপে শিষ্যের অন্ন, বস্ত্র ও বেশ সর্ব্বদা গুরুর অপেক্ষা হীন হইবে।

(৬) দ্যূতক্রীড়া, বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা, পরনিন্দা, মিথ্যাকথা এবং পরের অপকার প্রভৃতি পরিহার করিবে।

এইরূপ আরও অনেক ব্যবস্থা আছে। অতি সামান্য অভিনিবেশ সহকারে ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শাস্ত্রকারদিগের মতে শিক্ষার নিয়ম চারিটি—(১) কষ্টসহিষ্ণুতা, (২) বিলাসবিদ্বেষ, (৩) চিত্তসংযম, (৪) নিষ্ঠা। এই চারিটি একত্র না হইলে প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয় না। বাবুগিরি করিলে মানুষ শিক্ষিত হইতে পারে না। বিলাসপ্রিয় হইলে মানুষ পরিশ্রম করিতে পারে না এবং বিনা পরিশ্রমে জ্ঞান লাভ করা যায় না। বিকলচিত্ত বা বিকলেন্দ্রিয় হইলে মানুষের অভিনিবেশ ও একাগ্রতা নষ্ট হইয়া যায়, মানুষ কোন কাজই করিতে সমর্থ হয় না। যে কাজই কর, নিষ্ঠা না থাকিলে, অর্থাৎ দেহের ও মনের যত শক্তি আছে, সেই সমস্ত শক্তি সেই কাজে বিনিযুক্ত না হইলে, সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। একটি কাজ করিতে করিতে অন্য কাজে মন দিলে কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না। কোন একটি কাজ যেমন করিয়া করা উচিত, তেমন করিয়া করিতে হইলে তন্ময় হওয়া আবশ্যক। সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ ব্যতিরেকে কেহ কখন ঈপ্সিত বস্তুলাভ করিতে পারে নাই।

শিক্ষার নিয়ম সম্বন্ধে মন্তব্য।

প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মচর্য্যের যে নিয়ম ছিল, এখনও কি সেই নিয়ম আছে? বলিতে দুঃখ হয়, সে নিয়ম এখন নাই। লোকে

এখন সন্তান-সন্ততিকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চায় না। পথ হাঁটিতে কষ্ট হইবে বলিয়া ছেলেকে গাড়ী করিয়া স্কুলে পাঠায়। ছেলের গায় একটু রৌদ্র লাগিবে বলিয়া হাতে ছাতা না দিয়া ছেলেকে বিদ্যালয়ে যাইতে দেয় না। পঠদ্দশাতেই আমাদের বালক এবং যুবকদিগকে বিলক্ষণ বিলাসপ্রিয় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা উত্তম উত্তম জুতা, উত্তম উত্তম বস্ত্র, পমেটম প্রভৃতি নানাগন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে, কখন কখন জামার বোতামে বড় বড় গোলাপ ফুল গুঁজিয়াও স্কুলে যায়। এই সকল কারণে এখন তাহাদের অধ্যয়নে নিষ্ঠা নাই। ইহা ব্যতীত আরো কতকগুলি কারণবশতঃ এখন ছাত্রের নিষ্ঠা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। ছাত্রদিগকে এখন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্ম্মবিষয়ক আন্দোলনে নিযুক্ত হইতে দেখা যায়। তদ্দারা তাহাদের অধ্যয়নে নিষ্ঠা কমিয়া যাওয়া এবং চিত্তসংযমে বিঘ্ন ঘটাই সম্ভব। ঐ সমস্ত আন্দোলনে তাহাদের নিযুক্ত হওয়া অকর্ত্তব্য। আন্দোলন যাহার কার্য্য, আন্দোলন ভিন্ন তাহার অন্য কার্য্য থাকা উচিত নয়। কেন না, অন্য কার্য্য থাকিলে তাহার আন্দোলন হয় বিফল, নয় অসম্পূর্ণ বা অঙ্গহীন হয়। তেমনি অধ্যয়ন যাহার কার্য্য, অধ্যয়ন ভিন্ন তাহার অন্য কার্য্য থাকিলে তাহার অধ্যয়ন হয় বিফল, নয় অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ হয়। দর্শন গ্রন্থ লিখিতে লিখিতে পার্লিয়ামেণ্টে বসিতে গিয়া জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের কি হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। রাজনীতি-ব্যবসায়ী ডিস্‌রেলীর উপন্যাসলেখক বলিয়া ভাল যশ

হইল কৈ ? লর্ড ব্রুহাম নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া কোন বিষয়েই অক্ষয় যশ সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। রাজাধিরাজ লুই নেপোলিয়ন সিজারের ইতিহাস লিখিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত গ্রন্থকার বলিয়া উচ্চ আসনে বসাইল না। তাই বলি, অধ্যয়ন যাহার কাজ, অধ্যয়ন ভিন্ন তাহার অন্য কাজ না থাকিলেই ভাল হয়। অধ্যয়ন শেষ করিয়া অন্য কাজ করিলে অধ্যয়নও ভাল হয়, অন্য কাজও ভাল হয়। এদেশে অধ্যাপকমহলে প্রবাদই আছে—ক্ষণাদূর্দ্ধমতার্কিকঃ—অর্থাৎ তর্কশাস্ত্রাধ্যায়ী একদণ্ড শাস্ত্রচিন্তা হইতে বিরত হইলে তাহার অধীত শাস্ত্র বিফল হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অধ্যয়ন একটি মহাযোগ। বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলে সে মহাযোগ ভঙ্গ হয়।

তবেই বুঝা যাইতেছে যে, শিক্ষার যাহা প্রকৃত নিয়ম, এদেশে এখন তাহা নাই। এখন শিক্ষার্থীর কষ্টসহিষ্ণুতা নাই, চিত্তসংযম নাই, নিষ্ঠা নাই। কিন্তু এগুলি না থাকিলে মানুষের প্রকৃত শিক্ষা হয় না; মনুষ্যজীবনের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হয় না, মানুষ মানুষ হয় না। Smile Self-help এবং Craik's Pursuit of knowledgunder difficulties প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল লোকের মানুষ হওয়ার বিবরণ লিখিত আছে, এই সকল গুণ ছিল বলিয়াই তাঁহারা মানুষ হইতে পারিয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, অধ্যয়ন একটি কঠোর তপস্যা। কিন্তু এ তপস্যা

আমরা এখন ভুলিয়া গিয়াছি। আবার আমাদের এ কঠোর তপস্যা শেখা আবশ্যক হইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্য ও কঠোরতা।

এই স্থলে একটি সম্ভবপর প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক। হিন্দু শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যের যেরূপ ব্যাখ্যা দেখা গেল, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কঠোরতাই ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত প্রাণ এবং গূঢ় অর্থ। যদি তাহাই হয়, তবে কোমলতার সহিত কি মানুষের কোন সম্পর্ক নাই বা রাখা উচিত নয়? আকাশে মেঘের যে খেলা হয় মানুষ কি তাহা চক্ষু মেলিয়া দেখিবে না? স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনীতে সান্ধ্য সমীরণে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণপ্রভ বীচি উৎক্ষিপ্ত হয়, মানুষ কি তাহা দেখিবে না? বসন্তে বসুন্ধরা যে অপূর্ব্ব পুষ্পাবরণে আবৃতা হয়, মানুষ কি তাহা দেখিবে না? অবশ্য দেখিবে। না দেখিলে মানুষ মানুষ হইবে না। মনুষ্যদেহে কঠিন অস্থিও আছে, কোমল মাংসও আছে। জগতে রুদ্র রৌদ্রও আছে, কমনীয় কৌমুদীও আছে। বিশ্বের এই দুই মূর্ত্তি ধ্যান না করিলে মানুষ মানুষ হয় না। বিশ্বে কঠিনতা ও কোমলতা দুই-ই আছে। ব্রহ্মচারী দুইএর ধ্যান করিয়া থাকেনও বটে—কঠিনতার ধ্যানও যেমন করেন, কোমলতার ধ্যানও তেমনি করেন। লক্ষ্মণ মাতৃপদবীতে আরোহণোন্মুখা সীতা দেবীকে তপোবনে রাখিয়া আসিলেন। ব্রহ্মচারী বাল্মীকি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বলিলেন:—

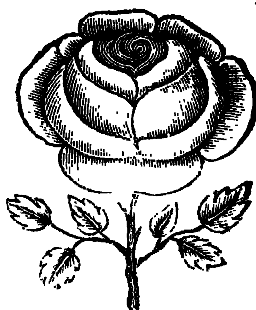
"তুমি নিজ বলের অনুরূপ জলকলস লইয়া যখন আশ্রমের চারাগাছগুলিকে বাড়াইবে, তখন স্তন্যপায়ী শিশুর উপর প্রসূতির যে অপূর্ব্ব প্রীতি, তাহা তুমি তোমার পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বেই অনুভব করিবে।"

পৃথিবীর কোমলতার কি চমৎকার, কি রমণীয়, কি মহিমময় ধ্যান! পৃথিবীর নীল আকাশ, পৃথিবীর স্বচ্ছ সলিল, পৃথিবীর সুপ্রস্ফুটিত পুষ্প, পৃথিবীর সুকণ্ঠ, পৃথিবীর সুগন্ধ, পৃথিবীর সুন্দর দেহ, পৃথিবীর শ্যামল কান্তি এই রূপে ধ্যান করিও, তোমার ব্রহ্মচর্য্যের বিঘ্ন না হইয়া, বল বৃদ্ধি হইবে। কেন না এইরূপ ধ্যানে পৃথিবীর মোহ কমিয়া প্রীতির বৃদ্ধি হয়, আত্মাদর বিনষ্ট হইয়া বিশ্বের প্রতি আদর বর্দ্ধিত হয়। যাহার তপস্যা যত কঠোর, তাহার কোমলতার তত প্রয়োজন। কারণ যতদিন জড়ত্ব, ততদিন শ্রান্তি, আর ততদিন বিশ্রামের আবশ্যকতা। প্রখর রবিকরপীড়িত পথিকের সুস্নিগ্ধ সুগন্ধ জলের যত প্রয়োজন আর কাহারো তত নয়, এবং সেই পথিকের হাতে সেই জল যত পুণ্যপথগামী আর কাহারো হাতে তত নয়। সেই জন্য প্রাচীন ভারতে তপস্বীর তপোবনেই বেশী ফুল ফুটিত, বেশী মৃগ মৃগী খেলিয়া বেড়াইত, বেশী কল্লোলিনীর কলকণ্ঠ শুনা যাইত। বাস্তবিক ব্রহ্মচারী ভিন্ন জগতের সৌন্দর্য্যের প্রকৃত অধিকারী আর কেহ নাই। ব্রহ্মচারীর চক্ষে জগতের সৌন্দর্য্য দেখিও, তাহা হইলে সে সৌন্দর্য্যের প্রসর তুমি যত দেখিবে আর কেহই তত দেখিবে না।

বর্ত্তমান কাল ও ব্রহ্মচর্য্য-বিধি।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মচর্য্যের কাল চলিয়া গিয়াছে, এখন আর ব্রহ্মচর্য্য চলে না। কেন তাঁহারা এরূপ মনে করেন ভাল বুঝা যায় না। ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ—কষ্টসহিষ্ণুতা, বিলাসবিদ্বেষ, ইন্দ্রিয়দমন, চিত্তশুদ্ধি ইত্যাদি। অথবা যে প্রণালীতে জীবন যাপন করিলে এই সকল গুণের অধিকারী হইতে পারা যায়, সেই প্রণালীর নাম ব্রহ্মচর্য্য। তবে ব্রহ্মচর্য্য এখনকার কালে চলিতে পারে না, এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ কি ? ইন্দ্রিয়দমন, বিলাসবিদ্বেষ, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি গুণ যদি এখনও মানুষের আবশ্যক হয়, এখনও গুণ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে ব্রহ্মচর্য্য সেকালের অনুষ্ঠান, একালের নয়, একথা বলিবার হেতু কি ? একটু হেতু থাকিতে পারে। শাস্ত্রে বলে, ব্রহ্মচারী প্রতিদিন প্রত্যূষে গুরুর নিমিত্ত দূর হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিবে। কেহ কেহ হয় ত মনে করিতে পারেন, এ সকল কাজ সেকালে করা যাইতে পারিত, একালে কি করা যায় ? আর সম্ভবতঃ এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা বলেন—ব্রহ্মচর্য্য সেকালের, একালের নয়। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এইরূপ কার্য্যের ব্যবস্থা, তাহা অন্যরূপ কার্য্যের দ্বারাও ত সাধন করা যাইতে পারে। স্বাস্থ্য লাভের নানা উপায় আছে, গুরুভক্তি অনুশীলনেরও নানা পন্থা আছে। যে উপায় যখন ভাল বোধ হইবে, সে উপায় তখন অবলম্বন করা যাইতে পারে ; যে পন্থা যখন উত্তম বোধ হইবে, সে পন্থা তখন অনুসরণ করা যাইতে

পারে। তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না। অতএব শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যের যে পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট আছে, শুধু তাহা দেখিয়া যদি কেহ বলেন যে, ব্রহ্মচর্য্য সেকালের, এ কালের নয়, তাহা হইলে তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন; কিন্তু শুধু ব্রহ্মচর্য্যের পদ্ধতি বিবেচনা না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য কি জিনিস তাহা বিবেচনা করিয়াও যিনি বলেন ব্রহ্মচর্য্য সেকালের, এ কালের নয়— তাঁহার কথা নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য।

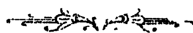




তৃতীয় অধ্যায়।



আখ্যায়িকা ও জীবনী।



ক। আখ্যায়িকা।



ধ্রুব।

[দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।]

উত্তানপাদ রাজার সুরুচি ও সুনীতি নামে দুই মহিষী ছিলেন। রাজা সুরুচিকে যত ভালবাসিতেন, সুনীতিকে তত ভালবাসিতেন না। সুরুচির গর্ভে রাজার এক পুত্র হয়, তাহার নাম উত্তম, এবং সুনীতির গর্ভে এক পুত্র হয়, তাহার নাম ধ্রুব। একদিন রাজা উত্তমকে কোলে করিয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময় ধ্রুব তথায় আসিল এবং ভাইকে পিতার কোলে বসিয়া

খেলা করিতে দেখিয়া আপনিও পিতার কোলে উঠিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু সুরুচি তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। পাছে তিনি অসন্তুষ্ট হন এই ভাবিয়া রাজা ধ্রুবকে কোলে লইতে পারিলেন না। ইহা দেখিয়া সুরুচি ধ্রুবকে বলিলেন—'যে কোলে তুমি উঠিতে চাহিতেছ, সে কোলে উঠিবার যোগ্য তুমি নহ। পৃথিবীর মধ্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই সে কোলে উঠিবার উপযুক্ত। তুমি যদি আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে, তাহা হইলে ঐ কোলে উঠিতে পারিতে। ঐ রাজ-সিংহাসন সম্রাটের স্থান। আমার পুত্র উত্তমই ঐ স্থানের অধিকারী এবং উপযুক্ত। সুনীতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া কোন্ সাহসে তুমি ঐ উচ্চস্থান অধিকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ?' বিমাতার তিরস্কার বালক ধ্রুবের অন্তরে আঘাত করিল। বালক ক্ষুণ্ণ হইয়া মাতার কাছে গেল এবং তাঁহাকে সকল কথা বলিল। দুঃখিনী সুনীতির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। চিরকাল দুঃখভোগ করিয়া তিনি সকল দুরাশা পরিত্যাগ করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি বালক ধ্রুবকে দুঃখ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন যে, 'লোকে পুণ্যফলে রাজসিংহাসন, রাজছত্র, অতুল ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি লাভ করে। তোমার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ছিল না বলিয়া এ জন্মে তোমার ভাগ্যে রাজপদ ও অতুল ঐশ্বর্য্য হইল না। অতএব তোমার যে অবস্থা, তাহাতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত।'"

মানুষের এ জন্মের অবস্থা তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল।

সুতরাং আপনার কর্ম্মফলে যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ইহা অদৃষ্টবাদীর কথা। সুনীতি হিন্দুরমণী। হিন্দুরমণী অদৃষ্টবাদিনী। তাই সুনীতি এই কথা বলিলেন। কিন্তু যে অদৃষ্ট মানে, তাহার কি অবস্থান্তরের আশা নাই? আছে বৈ কি। সেই জন্য সুনীতি পুনশ্চ বলিলেন :—'অথবা যদি সুরুচির বাক্যে তোমার মনোমধ্যে অতিশয় দুঃখ বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহাতে সকল প্রকার অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় এরূপ পুণ্যসঞ্চয়ে যত্নবান্ হও। এবং সুশীল, ধর্ম্মাত্মা ও সর্ব্বপ্রাণীর হিতানুষ্ঠানে রত হইয়া সকলের প্রতি বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতে আরম্ভ কর; কারণ, জল যেমন নিম্নাভিমুখেই গমন করে, সেইরূপ সকল ঐশ্বর্য্যই সৎপাত্রের প্রতি ধাবমান হইয়া থাকে।'

কর্ম্মদোষে বা পুণ্যাভাবে দুরবস্থা হইলে সে দুরবস্থা হইতে যে নিষ্কৃতি নাই তাহা নহে। সৎকর্ম্ম করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিলে অবশ্যই উত্তম অবস্থা লাভ করা যায়। অদৃষ্টবাদের এমন অর্থ নয় যে, যাহার ভাগ্যে যাহা একবার ঘটে, তাহার ভাগ্যে তাহা চিরকালই থাকিয়া যায়, সে তাহা কখনই ছাড়াইতে পারে না। তাই অদৃষ্টবাদিনী সুনীতি পুত্র ধ্রুবকে বলিলেন—পুণ্যসঞ্চয় কর; একদিন না একদিন অবশ্যই মনোমত পদ ও সম্পদ্ প্রাপ্ত হইবে। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, কোন একটি কর্ম্মফল হইতে যে একেবারেই অব্যাহতি হয় না তাহা নয়। ভিন্ন রকম কর্ম্ম করিলে মানুষ আবার সেই ভিন্ন কর্ম্মের ফলভোগী হয় এবং এই প্রকারে পূর্ব্বকর্ম্মফল হইতে মুক্তি লাভ করে। অর্থাৎ

কর্ম্মফল অথবা চলিত কথায় যাহাকে অদৃষ্ট বলে, তাহা অত্যাজ্য অনন্তকালস্থায়ী বজ্র-নিগড় নয়।

যাহা হউক, সুনীতির কথা ধ্রুবের মনে ধরিল না। সুনীতির কথামত চলিতে গেলে ধ্রুবকে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগ করিয়া তবে ইহজন্মের পুণ্যফলস্বরূপ উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। ধ্রুব তাহা করিতে অসম্মত হইলেন। ধ্রুব মাতাকে স্পষ্টই বলিলেন ঃ—'জননি! তুমি আমাকে সান্ত্বনার নিমিত্ত যে সকল কথা বলিলে, তাহা আমার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারিতেছে না; কারণ, বিমাতার দুর্ব্বাক্যে আমার হৃদয় একেবারে বিদীর্ণপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমি যাহাতে নিখিল জগতের পূজ্য ও সকলের শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হই, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইব। রাজা আমার বিমাতা সুরুচিকে ভালবাসেন; আমি তাঁহার উদরে জন্মি নাই, তোমার উদরে জন্মিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু জননি. আমার কিরূপ প্রভাব দেখ! আমার ভ্রাতা উত্তমকে তুমি গর্ভে ধারণ কর নাই, পিতা তাঁহাকে রাজসিংহাসন প্রদান করুন, সে পৃথিবীর সম্রাট্ হউক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। মাতঃ! যাহা অন্যে দিবে, এরূপ পদ আমি চাই না। যাহা আমার পিতাও প্রাপ্ত হন নাই, আমি স্বীয় পুণ্যদ্বারা এরূপ শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিতে ইচ্ছা করি।'

কি অভিমান! কি তেজ! কি আকাঙ্ক্ষা! কি সাহস! কি বিক্রম! রাজ্য চাই না, রাজ্য ত তুচ্ছ জিনিস। সম্রাট্ হইতে চাই না, সম্রাট্ হওয়া ত সামান্য কথা। চাই অনন্ত

বিশ্বের পূজ্য হইতে, অনন্ত বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান পাইতে, যে স্থান পিতা পিতামহ কেহ কখনও পান নাই, চাই সেই স্থান পাইতে! আর সে স্থান কাহারো কাছে ভিক্ষা চাই না, স্নেহের বা অনুগ্রহের দানস্বরূপ চাই না, আপনার তেজে, আপনার ক্ষমতায়, আপনার প্রভাবে আপনি করিয়া লইতে চাই। ইহাকেই বলে পূর্ণ পুরুষত্ব, ইহাকেই বলে পুরুষকারের পূর্ণমাত্রা।

এই অপূর্ব্ব পুরুষকার লইয়া ধ্রুব আর একটি মাত্র কথা না কহিয়া বনে গমন করিলেন। তথায় কয়েকটি ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদিগকে মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। তাঁহারা সকলেই বলিলেন যে, বিষ্ণুকে পরিতুষ্ট করিতে পারিলে সকল অভিলাষই পূর্ণ হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেমন করিয়া বিষ্ণুকে পরিতুষ্ট করা যায়?' তাঁহারা তাঁহাকে প্রণালী বুঝাইয়া দিলেন। তিনি প্রণালী শিখিয়া আর একটি বনে গিয়া অনন্যমনে ভগবান্‌কে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। তখন ক্ষুদ্র বালকের পদভরে সসাগরা পৃথিবী বিকম্পিত হইয়া উঠিল, নদ নদী সমুদ্র বিক্ষোভিত হইল। দেবতারা ভয়ে আকুল হইয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেবতাদের মায়া-প্রভাবে বালক ধ্রুব দেখিলেন যে, তাঁহার দুঃখিনী মাতা অতি কাতর ভাবে তাঁহার কাছে আসিয়া অতিশয় করুণ স্বরে তাঁহাকে সেই উৎকট তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছেন। ধ্রুব

দেখিয়াও দেখিলেন না, শুনিয়াও শুনিলেন না। তখন দেবতারা তাঁহাকে নানা প্রকার ভয় দেখাইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে অসংখ্য ভয়ঙ্কর পশু আসিয়া ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। শব্দ করিবার সময় তাহাদের মুখ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু সমস্ত বিভীষিকাই নিষ্ফল হইল। ধ্যানমগ্ন বালক ধ্যানেই মগ্ন রহিলেন। তখন ভগবান্ হরি সেই বালকের তন্ময়তা দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার অভিলষিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্রুবলোক প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

দুর্ব্বাসার শাপ

রাজা দুষ্মন্ত কণ্ব মুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর তিনি শকুন্তলাকে মুনির আশ্রমে রাখিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া যান। এদিকে শকুন্তলা সকল কর্ম্ম ভুলিয়া—নিজ সখী অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে ভুলিয়া—আশ্রমের লতা-মৃগগুলিকে ভুলিয়া নিরন্তর পতিকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের ভিতর বামকরতলে গণ্ড স্থাপন করিয়া প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিষ্পন্দভাবে তিনি দুষ্মন্তকে ভাবিতেছেন। এমন সময়ে প্রজ্বলিত হুতাশনপ্রতিম

মহর্ষি দুর্ব্বাসা আসিয়া ভয়ঙ্কর স্বরে "অয়মহং ভোঃ" বলিয়া সেই ক্ষুদ্র কুটীরস্থিতা ক্ষুদ্র বালিকার সম্মুখে আতিথ্যপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। সেই ভয়ঙ্কর রবে সমস্ত আশ্রমারণ্য যেন কাঁপিয়া উঠিল। অদূরে প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলার ইষ্টদেতার পূজার নিমিত্ত পুষ্প চয়ন করিতেছিলেন, তাঁহারা যেন শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু পতিচিন্তানিমগ্না প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিস্পন্দা শকুন্তলা নিস্পন্দভাবেই রহিলেন। তখন তিনি তাঁহাতেই নাই; তখন তাঁহার কাছে বাহ্যজগৎ প্রলয়নিমগ্ন; তখন যদি এই গ্রহ-নক্ষত্রময় ব্রহ্মাণ্ড ঘোর রবে ছিন্নভিন্ন হইয়া মহাপ্রলয়-গ্রস্ত হইত, তাহা হইলে দুষ্মন্তময়ী শকুন্তলা সেই সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রলয়ে মিলাইয়া যাইতেন, জানিতেও পারিতেন না যে কি হইল! বজ্র-গম্ভীর স্বরে দুর্ব্বাসা শাপ দিলেন—'কি, আমি অতিথি, আমাকে অবজ্ঞা! যাঁহাকে অনন্যমনে ভাবিতেছ—তপস্বাকে উপেক্ষা করার অপরাধে তিনি যেন তোমায় ভুলিয়া যান।'

তথাপি শকুন্তলার সংজ্ঞা নাই—শকুন্তলা যেন জীবনহীনা। অভিসম্পাত করিয়া দুর্ব্বাসা চলিয়া গেলেন। এই বিষম শাপের ফলে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বিস্মৃত হইলেন, বিস্মৃত হইয়া শকুন্তলাকে তাড়াইয়া দিলেন, তাড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে অসুখী করিলেন এবং শেষে আপনিও অসুখী হইলেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, শকুন্তলা শাপগ্রস্তা হইলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, দুর্ব্বাসা শকুন্তলার কাছে আতিথ্য প্রার্থনা

করিয়াছিলেন, শকুন্তলা সে প্রার্থনা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাপসাশ্রমে অতিথি-সেবা একটি প্রধান কর্ত্তব্য। প্রাচীন ভারতে তাপসাশ্রমে সর্ব্বদাই অতিথির সমাগম হইত এবং আশ্রমবাসীদিগের সেই সকল অথিতির সেবা করিতে হইত। শকুন্তলা সেই অতিথি-সেবা-ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। তিনি অতিথি-সেবার কর্ত্তব্যতা এবং উৎকর্ষ বুঝিয়াও দুষ্মন্ত-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অতিথি ফিরাইয়া দিলেন। শকুন্তলা পতির চিন্তা করিতেছিলেন। পতিচিন্তা কিছু অপবিত্র কার্য্য নয়। কিন্তু সে চিন্তায় তিনি এতই নিমগ্না যে অতিথির সমাগম জানিতে পারিলেন না এবং সেই জন্য শাপগ্রস্তা হইলেন। ইহার মধ্যে আরও এক কথা আছে। হৃদয়ের অতি পবিত্র ভাবও অপবিত্র হইয়া পড়ে যখন উহা মানুষকে সমাজ ভুলাইয়া দেয়। সমাজ মনুষ্য-চরিত্রের উন্নতির প্রধান কারণ। মনুষ্য-চরিত্রে যাহা কিছু ভাল, উৎকৃষ্ট এবং মহৎ আছে, তাহার অধিকাংশই কেবল সমাজ আছে বলিয়া বিকাশ পায় এবং দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের যে সকল মানসিক শক্তি এবং হৃদয়ের প্রবৃত্তি আছে, তাহা সমাজ-সেবায় নিযুক্ত না হইলে পবিত্রতা লাভ করে না। সমাজ-সেবায় নিযুক্ত হইলেই সে সকল শক্তি এবং প্রবৃত্তি মহত্ত্বসংযুক্ত হয়। বাস্তবিক অগ্রে সমাজ, পরে আপনি—অগ্রে অপরের চিন্তা, পরে আপনার চিন্তা। আপনার চিন্তা অতি বিশুদ্ধ, -অতি প্রশংসনীয় হইলেও তদ্দারা যদি অপরের চিন্তা বিলুপ্ত হয়, তবে তাহা অতি অপরিশুদ্ধ, অতি নিন্দনীয় হইয়া

পরে। শকুন্তলা এই নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিলেন বলিয়া অভিশপ্তা হইয়াছিলেন এবং বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন।

ঔশীনর।

[আশ্রিতরক্ষা]

রাজা ঔশীনর যজ্ঞ করিতেছেন। তাঁহার মহত্ত্ব পরীক্ষার নিমিত্ত অগ্নিদেবতা কপোতরূপ ধারণ করিলেন এবং ইন্দ্র শ্যেন পক্ষীর আকার গ্রহণ করিয়া কপোতরূপী অগ্নির পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। কপোত শ্যেন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া প্রাণভয়ে রাজার ক্রোড়ে লুকাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। শ্যেন আসিয়া রাজার নিকট কপোত প্রার্থনা করিল। বিধাতা কপোতকে শ্যেনের ভক্ষ্য বস্তু করিয়াছেন—ক্ষুধার্ত্ত শ্যেন রাজার নিকট কপোত চাহিল। প্রাণভয়ে ভীত শরণাগত কপোতকে প্রত্যর্পণ করিতে রাজা অস্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিলেন—'মেষ, বৃষ, বরাহ, মৃগ, মহিষ প্রভৃতি পশু আহরণ করিতে পারি, অথবা অন্য কোন বস্তুতে অভিলাষ হইলে তাহাও এই-ক্ষণে প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু এই শরণাগত ভীত কপোতকে কোনক্রমেই পরিত্যাগ করিব না। যেরূপ কর্ম্ম করিলে তুমি এই পক্ষীকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হও, বল, আমি এখনই



উহা সম্পন্ন করিব, তথাপি এই কপোতকে প্রদান করিব না।' শ্যেন কহিল—'যদি এই কপোতপরিমাণ মাংস নিজ দেহ হইতে কাটিয়া দিতে পার, তবেই আমি পরিতুষ্ট হইয়া কপোতের কামনা পরিত্যাগ করিব।' 'তাহাই করিব' বলিয়া রাজা ঔশীনর তুলা-যন্ত্রের একদিকে কপোতকে বসাইয়া অন্যদিকে আপন হস্তে আপন দেহ হইতে মাংস কাটিয়া রাখিলেন। কপোত মাংসাপেক্ষা ভারি হইল। তখন আপন হস্তে আপন দেহ হইতে আর এক খণ্ড মাংস কাটিয়া মাংসের উপর রাখিলেন। তথাপি কপোত মাংস অপেক্ষা ভারি হইল। তখন আপন হস্তে আপন দেহ হইতে এক এক খণ্ড করিয়া অসংখ্য মাংসখণ্ড কাটিলেন, তথাপি কপোত মাংসাপেক্ষা ভারি হইল। অবশেষে সেই কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ লইয়া রাজা ঔশীনর স্বয়ং তুলাযন্ত্রে উঠিলেন। ইহা দেখিয়া শ্যেনরূপী ইন্দ্র ও কপোতরূপী অগ্নি নিজ নিজ রূপ ধারণপূর্ব্বক রাজার অক্ষয় যশ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। রাজাও ধর্ম্মপ্রভাবে ত্রিলোক উজ্জ্বল করিয়া দিব্য-দেহে স্বর্গে আরোহণ করিলেন।



শকুন্তলার পতিগৃহে গমন।



আশ্রমপালিতা আশ্রমপ্রিয়া তাপসবালা শকুন্তলা চির-কালের জন্য আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। তিনি সেই

পবিত্র আশ্রমের প্রাণস্বরূপা, তাঁহাকে গমনোদ্যতা দেখিয়া শকুন্তলা-পালিত আশ্রমটি যেন শোকবিহ্বল হইয়া উঠিল। মৃগদিগের মুখের কুশগ্রাস পড়িয়া যাইতেছে, ময়ূরেরা নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে এবং লতাসকল পাণ্ডুপত্র মোচনচ্ছলে যেন অশ্রুপাত করিতেছে। যাহাকে বাসস্থান হইতে বিদায় দিতে হইলে সমস্ত বাসস্থানটি বিরহকাতর বলিয়া অনুভব হয়, সে যথার্থ ই সেই বাসস্থানের প্রাণ! আজ তত্রত্য সকলেরই বোধ হইতেছে যে, পশু পক্ষী প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীর শান্তিময় আশ্রয়স্থল সেই পবিত্র আশ্রমটি প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছে। শকুন্তলা যে দিকে চাহিতেছেন, সেই দিকেই তাঁহার স্বহস্ত-প্রতিপালিত, তাঁহার সুমধুর স্নেহপরিপুষ্ট তরু লতা, মৃগ মৃগী সকল বিমর্ষ ভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কয়েক পদ গমন করিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। ব্যাকুলিতান্তঃকরণে কণ্বকে বলিয়া উঠিলেন—'পিতঃ! লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নাকে সম্ভাষণ করি।' পিতা জানিতেন যে আশ্রমের সকল পদার্থ ই শকুন্তলার স্নেহের বস্তু এবং শকুন্তলা আশ্রমের সকল পদার্থের প্রাণ। তিনি বলিলেন—'জানি, সেই লতার উপর তোমার সোদরস্নেহ আছে। এই সে দক্ষিণ পার্শ্বে রহিয়াছে।' অমনি শকুন্তলা বিদীর্ণ হৃদয়ে বলিলেন—'বনজ্যোৎস্নে! তুমি দূর-প্রসারিত শাখা-বাহু দ্বারা আমাকে আলিঙ্গন কর, আমি আজ অবধি তোমায় ছাড়িয়া যাইতেছি।' শকুন্তলা তাহাকে শুধু সম্ভাষণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়া

নাম্নী সখীদ্বয়কে কহিলেন—'সখি! আমি এই লতাটিকে তোমাদের দু'জনের হাতে সঁপিয়া দিলাম!' সখীদ্বয় আকুল প্রাণে বলিয়া ফেলিলেন—'আমাদিগকে কাহার হাতে সঁপিলে?'

তারপর সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শকুন্তলার প্রাণ আরো ব্যাকুল হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার গর্ভমন্থরা মৃগীটিকে দেখিতে পাইলেন। পাইয়া স্নেহপূর্ণা বিগলিতপ্রাণা জননীর ন্যায় বলিলেন—'এই উটজচারিণী গর্ভমন্থরা মৃগী যখন ভালয় ভালয় প্রসব হইবে, তখন তোমরা আমার নিকট লোক পাঠাইও, সে গিয়া আমাকে এই প্রিয় সম্বাদ দিবে।' আহা! ক্ষুদ্র বালিকার হৃদয় কতই ভালবাসিতে পারে, কত ভাবনাই ভাবিতে পারে! সে হৃদয় আজ কত যাতনাই সহ্য করিতেছে! পরক্ষণেই আবার কি যেন তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ হইতে গতিরোধ করিতে লাগিল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে, যে মৃগটির মুখ কুশাগ্রদ্বারা বিদ্ধ হইলে তিনি সযত্নে ক্ষতশোষক তৈলসেক করিতেন এবং যাহাকে শ্যামাক ধান্যমুষ্টি দিয়া পোষণ করিয়াছেন, সেই পুত্রাধিক প্রিয় মৃগটি মুখাগ্রদ্বারা তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে। স্নেহময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন। বনপশু যাঁহার স্নেহে মুগ্ধ, যাঁহার বিরহে আকুলিতপ্রাণ, তাঁহার ক্রন্দন দেখিলে সবারই হৃদয় কাঁদিয়া উঠে—ফাটিয়া যায়—গলিয়া বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাইয়াও যাওয়া হইতেছে না দেখিয়া, কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব কণ্বকে

বলিলেন—‘ভগবন্, শুনা যায় যে নদী বা সরোবর পর্য্যন্ত স্নিগ্ধ ব্যক্তির অনুগমন করা কর্ত্তব্য। এই অদূরে সরোবরতীর, যাহা বলিবার থাকে এখানে বলিয়া ফিরুন।’ তখন সকলে বটবৃক্ষ-চ্ছায়ায় উপবেশন করিলেন এবং মহর্ষি কণ্ব দুষ্মন্তকে যাহা বলিবার তাহা শার্ঙ্গরবকে বলিয়া দিলেন, শকুন্তলাকে যাহা বলিবার তাহা শকুন্তলাকে বলিলেন। পরে শকুন্তলাকে কহিলেন —‘বৎসে! তুমি আমাকে এবং সখীদিগকে আলিঙ্গন কর।’ শকুন্তলা জানিতেন কণ্ব তাঁহার সমভিব্যাহারী হইবেন না। কিন্তু প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়াকে ফেলিয়া যাইতে হইবে, তাহা তিনি ভাবেন নাই। এখন সহসা বুঝিলেন যে তাও তাঁহাকে করিতে হইবে। তিনি অতিশয় কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘পিতঃ! প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়া কি এ স্থান হইতে ফিরিয়া যাইবে?’ উত্তর প্রতিকূল হইল। কিন্তু সুশীলতমা শকুন্তলা বর্দ্ধিতযন্ত্রণা চাপিয়া রাখিয়া দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া বিহ্বল হৃদয়ে পিতাকে আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর সখীদ্বয়ের কাছে গিয়া বলিলেন—‘সখি! তোমরা দুইজনে এককালেই আমায় আলিঙ্গন কর!’ তিন হৃদয়ে এক হৃদয়, একটির পর আর একটি ভাল লাগিবে কেন? তিনটি সন্তপ্তহৃদয় এক হইয়া গেল।

যাওয়া ত আর হয় না। শার্ঙ্গরব বলিয়া দিলেন যে, প্রখর রবি মধ্যগগনে উঠিয়াছেন। তখন্ যেন চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া একান্তই যাইতে হইবে বুঝিয়া, আশ্রমের দিকে একবার শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতি-পরিমিত-যন্ত্রণা-

কাতর স্বরে শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিলেন—'পিতঃ! কবে আবার তপোবন দেখিব?' কাতর হৃদয়ের শেষ নিঃশ্বাস—জলমগ্নপ্রায় দুর্ভাগার শেষ চীৎকার—সংসারে ইহার অপেক্ষা যন্ত্রণা আর নাই। এ যন্ত্রণা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। কথাটি কণ্বের বুকে বাজিল। তিনি অনেক কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তখন আশ্রমবাসিনী বৃদ্ধা গৌতমী ব্যাঘাত বুঝিয়া বলিলেন—'বাছা! গমনকাল অতীত হইতেছে, পিতাকে ফিরাইয়া দেও। অথবা শকুন্তলা অনেকক্ষণ ধরিয়া পুনঃপুনঃ এইরূপ বলিবে, তুমিই ফিরিয়া যাও।' জ্ঞানময় তাপস হৃতজ্ঞান হইয়াছিলেন। সহসা যেন জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া শকুন্তলাকে বলিলেন—'বৎসে! তপোনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইতেছে।' পিতার তপোনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইতেছে শুনিয়া ধর্ম্মানুরাগিণী তাপসবালা আপনার সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার কোমল হৃদয় বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তিনি পিতাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—'তোমার শরীর তপশ্চর্য্যায় পীড়িত, অতএব আমার জন্য আর অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইও না।' তাপসপ্রধান দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন—'বৎসে! তুমি পর্ণশালার দ্বারদেশে যে পুড়ি-ধান্যের পূজোপহার দিয়াছিলে, তাহা হইতে এখন অঙ্কুর বাহির হইয়াছে। আমি যখন তাহা দেখিব, তখন কিরূপে আমার শোক সম্বরণ হইবে!' বিগলিত-হৃদয়া ক্ষুদ্র বালিকা এখন দৃঢ়মনা হইয়া সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিতে-ছেন; দৃঢ়মনা পুরুষপ্রধান এখন বিগলিতহৃদয়া ক্ষুদ্র বালিকা

হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ধন্য রমণীহৃদয়! সে হৃদয়ের কাছে জগতের ইন্দ্রতুল্য পুরুষও অবনত, জগতের তাপস-কুলাচার্য্যও বিজিত! সে হৃদয় অতিমাত্র কোমল হইয়াও অতিমাত্র দৃঢ়!

তার পর সহযাত্রিগণের সহিত শকুন্তলা নিস্ক্রান্ত হইলেন। কাশ্যপাশ্রম প্রাণহীন হইল—হিমালয়-প্রদেশের বন-জ্যোৎস্না ডুবিল!

দুষ্মন্ত।

—০॰❋॰০—

[কর্ত্তব্যনিষ্ঠা।]

দুষ্মন্ত রাজা—ভারতের অতুল মহিমা-সম্পন্ন চন্দ্রবংশীয় রাজগণের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় রাজা। তিনি রত্নগর্ভা ভারতভূমির অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। ঐশ্বর্য্যসুলভ বিলাস-রাশি, মনে করিলেই তাঁহার হইতে পারে; কিন্তু তিনি বিলাস-বিদ্বেষী। তিনি বীরোচিত কার্য্য-নিরত। তিনি শারীরিক সুখ তুচ্ছ করিয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে প্রচণ্ড রবিকিরণে বীরের ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকেন। বিলাসীর ন্যায় তাঁহার দেহ জীবন-প্রভাহীন শিথিল-গ্রন্থি নয়। গিরিচর হস্তীর ন্যায় সে দেহ বিপুল বলব্যঞ্জক। তিনি পুরুষপ্রধানের ন্যায় সর্ব্বদাই পুরুষোচিত কার্য্যে নিযুক্ত। তিনি শত্রুদমনে ক্ষিপ্রহস্ত।

রাজকার্য্যে তাঁহার গভীর অভিনিবেশ ও অপরিমেয় শ্রমশীলতা। তাঁহার কর্ত্তব্যানুরাগ কিরূপ প্রগাঢ় ছিল তাহারই কিঞ্চিৎ উল্লেখ এ স্থলে করিব।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, যে শকুন্তলাকে বিবাহ করিবার পর তাঁহাকে কণ্বের আশ্রমে রাখিয়া দুষ্মন্ত স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইত্যবসরে শকুন্তলা দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক শাপ-গ্রস্তা হন। ঐ ব্যাপার অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা নাম্নী শকুন্তলার দুই সখী ভিন্ন অপর কেহই জানিত না। শাপ দিয়া দুর্ব্বাসা যখন চলিয়া যান, সেই সময়ে তাহারা দুইজনে তাঁহাকে বহু অনুনয় করায়, তিনি বলিয়াছিলেন যে দুষ্মন্ত-প্রদত্ত কোন নিদর্শন দেখাইলে তাঁহার শকুন্তলাকে মনে পড়িবে, নতুবা মনে পড়িবে না। বিবাহকালে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে একটি অঙ্গুরীয়ক দিয়াছিলেন। কিন্তু দৈবযোগে তিনি তাহা হারাইয়া ফেলেন। অনন্তর শার্ঙ্গরব প্রভৃতি তাঁহাকে লইয়া দুষ্মন্তের সমীপে উপনীত হইলেন। দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবে দুষ্মন্ত তখন বিবাহ-বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। শকুন্তলাও তৎপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক প্রদর্শনে অসমর্থা হইলেন। কাজেই তিনি তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং নিজগৃহে স্থান দিতে পারিলেন না।

কিছুদিন পরে ঘটনাক্রমে সেই নিদর্শনাঙ্গুরীয়কটি দুষ্মন্তের হস্তে আসিল। তখন তাঁহার সকল ঘটনা মনে পড়িল। শকুন্তলার কথা স্মরণ করিয়া তিনি অনুতাপে দগ্ধ হইতে

লাগিলেন। যে রকম নিষ্ঠুর ভাবে তিনি শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন তাহা মনে করিয়া তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার জীবন যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিল। দিবারাত্রের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার শান্তি নাই। তিনি সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত চুল্লীর ন্যায় অনুতাপানলে সন্তপ্ত। আমোদ আহ্লাদ আর তাঁহার ভাল লাগে না। তিনি বসন্তোৎসব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার শরীর কৃশ হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার প্রভাময় গম্ভীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, তাঁহার তীক্ষ্ণোজ্জ্বল চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। এই শোচনীয় অবস্থায় একদিন দুষ্মন্ত রাজোদ্যানে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। বৃদ্ধ কর্ম্মচারী কঞ্চুকী সকলই জানেন, সকলই বুঝেন। কিন্তু আজ পুরুবংশের দুর্দ্দিন দেখিয়া, ভীতিবাৎসল্যপূর্ণ মনে তিনি ভাবিতেছেন—বুঝি একটু 'খেলাধূলা' করিলে দুষ্মন্ত কিছু 'আনমনা' হইবেন। এই মনে করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ব্যায়াম-ভূমিতে যাইবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। অশীতিবর্ষীয় পলিতকেশ কুলকর্ম্মচারীর মুখে এরকম কথা শুনিলে যুবা পুরুষের কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইবার কথা। বোধ হয় সেইজন্য বৃদ্ধ কঞ্চুকীকে কিছু না বলিয়া দুষ্মন্ত বেত্রবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'অমাত্যকে গিয়া বল, তিনি পৌরকার্য্য যাহা দেখিয়াছেন তাহা লিখিয়া দিন।' বেত্রবতী চলিয়া গেল। ইত্যবসরে দুষ্মন্ত শকুন্তলার চিত্রিত মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। চিত্র দেখিতে দেখিতে তিনি উন্মত্তবৎ হইয়া

উঠিলেন। চিত্রিত শকুন্তলাকে তাঁহার জীবনময়ী শকুন্তলা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি আপনাকে আপনি ভুলিয়া গেলেন। তিনি স্থান-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে বেত্রবতী আসিয়া তাঁহাকে রাজকার্য্যের সংবাদ দিল। অমনি, যেন তাঁহার কিছুই হয় নাই, এইরূপ স্থির গম্ভীর ভাবে তিনি কাগজপত্রগুলি পাঠ করিয়া প্রধান অমাত্যের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলেন। বিচার্য্য বিষয়—এক অপুত্রক মৃত বণিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনির্ণয়। এই উপলক্ষে শুধুই যে তিনি অমাত্যের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলেন তাহা নহে, তিনি সমস্ত প্রজার মঙ্গলার্থ স্নেহবান্ পিতার ন্যায় এই স্নেহপূর্ণ আজ্ঞা প্রচার করিলেন—'যেই যখন বন্ধুহীন হইবে, দুষ্মন্ত তাহার বন্ধুস্থানীয় হইবেন।' আজ্ঞা লইয়া বেত্রবতী চলিয়া গেল।

অনন্তর তাঁহার নিজের অপুত্রকাবস্থা স্মরণ হইল। তখন মাতৃপদবীতে আরোহণোদ্যতা শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যানের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া তাঁহার মন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিল। তিনি যন্ত্রণাবিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় ভূতলশায়ী হইলেন। মূর্চ্ছিতপ্রায় পড়িয়া আছেন এমন সময় বিপন্নের ভয়ার্ত্ত রব শ্রুত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র সংবাদ পাঠাইলেন—দেবলোক শত্রুপীড়িত। অমনি কর্ম্মবীর দুষ্মন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আর তাঁহার শকুন্তলা-চিন্তা নাই। আর তাঁহার শকুন্তলা-চিন্তাজনিত শারীরিক দুর্ব্বলতাও নাই। এখন তিনি যে দুষ্মন্ত সেই দুষ্মন্ত! বিপরীত বিক্রম সহকারে

তিনি ধনুর্ব্বাণ উঠাইয়া লইলেন। নিমেষমধ্যে সকল কথা অবগত হইয়া দেবতাদিগের সাহায্যার্থ পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া অসুরনাশে শূন্যপথে উত্থিত হইলেন।

এখন একবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে উপস্থিত দুষ্মন্তের কি ভয়ানক অবস্থা! তিনি ন্যায়পরায়ণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। তিনি পরিণীতা ভার্য্যাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কি অবিচার, কি অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, তাহা তিনিই বুঝিতেছেন! তাহাতে আবার তিনি জানেন না যে সেই নিরপরাধা এখন কোথায়। আর যে কখন তাঁহাকে পাইবেন, সে আশাও এখন তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। যে আশার বলে লোকে দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে, সে আশাও তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন তাঁহার হৃদয় আশাশূন্য, অনন্ত যন্ত্রণাগার! কিন্তু অসুরবধে আহূত হইবামাত্র তাঁহার সে সকলই যেন কোথায় কি হইয়া গেল! তখন আগ্রহাতিশয় সহকারে যুদ্ধসজ্জা করিয়া স্বীয় বয়স্যকে বলিলেন—'প্রধান অমাত্যকে জানাইও যে তিনি যেন আমার স্থানীয় হইয়া প্রজাপালন করেন। উপস্থিত আমার ধনুর্ব্বাণ দেবকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে।' এই বলিয়া তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দুষ্মন্ত নিজের সুখ দুঃখ সকলই ভুলিতে পারেন, কিন্তু যে কোটি কোটি হৃদয়ের সুখ দুঃখ অনতিক্রমণীয়, নিয়তির বিধানে তাঁহার হস্তে ন্যস্ত, তাহাদের সুখ দুঃখ ভুলিতে তিনি নিতান্তই অসমর্থ। ইহারই নাম কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা।

সাবিত্রী।

—:*:—

[আদর্শনারী]

সাবিত্রী রাজা অশ্বপতির কন্যা। তিনি যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে বরান্বেষণে তৎপর হইতে বলিলেন। তিনি রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান্‌কে পতিরূপে নির্ব্বাচন করিলেন। দ্যুমৎসেন তখন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অন্ধাবস্থায় পুত্র সহ বনবাসী। বর মনোনীত করিয়া আসিয়া সাবিত্রী দেবর্ষি নারদের নিকট শুনিলেন যে, যাঁহাকে পতিরূপে মনোনীত করিয়া আসিয়াছেন, এক বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হইবে। তাঁহার পিতা তাঁহাকে অন্য পাত্র মনোনীত করিতে বলিলেন। তিনি কিন্তু দৃঢ়তা সহকারে উত্তর করিলেন :— 'আমি একবার যাঁহাকে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছি, তিনি দীর্ঘায়ু হউন বা অল্পায়ুই হউন, গুণবান্ হউন বা নির্গুণই হউন, তিনি ভিন্ন আমি অপর ব্যক্তিকে বরণ করিতে পারি না।'

দীর্ঘায়ু হউন বা অল্পায়ুই হউন তিনি ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে আর পতিরূপে বরণ করিতে পারিব না—একথা বিষম দৃঢ়তা-সূচক। কথা শুনিয়া স্বয়ং নারদ অশ্বপতিকে বলিলেন :— 'তোমার কন্যা সাবিত্রীর বুদ্ধি অবিচলিতা, এই সতীত্ব ধর্ম্ম হইতে ইহারে কোন প্রকারে নিবারিত করিতে পারা যাইবে না।'

নারদই সত্যবানের বিধলিপির বিষয় জ্ঞাত থাকিয়া, সাবিত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে সেই সময় অশ্বপতির সভায় আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু সাবিত্রীর দৃঢ়তা দেখিয়া বিবাহ নিবারণ করিতে আসিয়া, তিনিই বিবাহে অনুমতি দিয়া চলিয়া গেলেন। এখন সাবিত্রী তাঁহার পিতাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার অর্থ-নির্ণয় আবশ্যক। তাঁহার কথার তাৎপর্য্য এই যে, সত্যবান্‌কে বিবাহ করিয়া যদি তাঁহাকে যাবজ্জীবন বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তিনি তাহা করিবেন, তথাপি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। সাবিত্রী যেমন-তেমন রমণী হইলে, নারদের মুখে সত্যবানের বিধিলিপির কথা শুনিয়া বৈধব্যের ভয়ে ভীত হইয়া, অন্য পতি মনোনীত করিয়া তৎক্ষণাৎ পিতার আদেশ পালন করিতেন, মনোময়ীর ন্যায় কখনই বলিতে পারিতেন না ঃ—লোকে, মনে মনে কোন বিষয় নিশ্চয় করিয়া পরে বাক্য দ্বারা তাহা ব্যক্ত করে এবং পরিশেষে কর্ম্ম দ্বারা তাহা অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব উপস্থিত বিষয়ে আমার মনই প্রমাণ।'

সাবিত্রীর নিকট মনই প্রধান; বৈধব্যের ভয়ে তিনি সে মনের বিপর্য্যয় বা বিনাশ ঘটাইতে পারেন নাই। সত্যবানের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল।

সাবিত্রীর শরার ষোলকলায় পূর্ণ ছিল—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্তই সুন্দরীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় সুগঠিত সুপরিস্ফুট ছিল। তাঁহাকে কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায় অবলোকন করিয়া লোকে মনে

করিত, ইনি দেবকন্যা মানবী হইয়া অবনীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন! রূপে সাবিত্রী অতুলনীয়া, কিন্তু তিনি মনোময়ী; জানিতেন না যে, তাঁহার রূপ অতুনীয়, দেখিতে তিনি কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায়। জানিলে, দুঃস্থ দরিদ্র দ্যুমৎসেনের বধূ হইয়াও তিনি পিতৃপ্রদত্ত বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া বল্কলকাষায় পরিধান করিতেন না, পরিধান করিতে পারিতেনও না। তিনি যে রূপবতী, এ জ্ঞানই তাঁহার ছিল না। রূপ আছে, এই জ্ঞান থাকিলে রূপের অভিমান, রূপের গর্ব্ব, রূপের মোহ, থাকিবেই থাকিবে। সাবিত্রীর এ সকল কিছুই ছিল না। তাই বলি তিনি অশরীরী ছিলেন—অশরীরীর রূপের অভিমান থাকে না।

মনোময়ীর মনের কি শক্তি! বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি শুনিয়াছিলেন—এক বৎসর পরে পতি কালগ্রাসে পতিত হইবেন। যে রমণীর সাবিত্রীর ন্যায় সতীত্ব, সাবিত্রীর ন্যায় পতিপ্রেম এবং সাবিত্রীর ন্যায় পাতিব্রত্য, একবৎসর পরে পতির মৃত্যু অনিবার্য্য জানিলে, তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ হয়, সকলেই অনুমান করিতে পারেন। নারদ যে সাংঘাতিক কথা বলিয়া গিয়াছিলেন —এক বৎসর কাল সাবিত্রীর মনে তাহা দিবানিশি জাগরূক ছিল —কি শয়নে কি উপবেশনে, কোন অবস্থাতেই তিনি তাহা ভুলিতে পারেন নাই। দশ দিন এমন দুর্ভাবনায় থাকিলে কত রমণী পাগল হইয়া যায়; কেহ হয়ত আপন প্রাণ আপনি নষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু সাবিত্রীর মানসিক শক্তি অতি অসাধারণ।

তাঁহার পতি একবৎসর পরে মরিবেন, এ কথা তাঁহার শ্বশুরগৃহে কেহই জানিতেন না, সত্যবান্ পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না। সাবিত্রী যদি সামান্যা নারী হইতেন, তাহা হইলে, তিনি মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া সকলেই এক প্রকার বুঝিয়া ফেলিত ; তিনি বড় শক্ত হইলেও অন্ততঃ তাঁহার পতিকে বলিয়া ফেলিতেন। কিন্তু সাবিত্রী সেই সাংঘাতিক কথা পতিকে পর্য্যন্ত বলেন নাই। তাঁহার মনে যে তেমন সাংঘাতিক কথা, সাংঘাতিক ব্যথা ছিল, শ্বশুর শ্বশ্রূ, পতি পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই ; শ্বশুর, শ্বশ্রূ, পতিকে পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে দেন নাই। সেই সাংঘাতিক কথা মনে লুকাইয়া রাখিয়া, সেই মর্ম্মান্তিক ব্যথায় কিছুমাত্র বিচলিত প্রতীয়মানা না হইয়া তিনি শ্বশুর, শ্বশ্রূ, পতি এবং অপর সকলের এমনি সেবা-শুশ্রূষা ও তুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, যেন তাঁহার মনে দুশ্চিন্তার লেশ মাত্র ছিল না, অন্তরে কোন ব্যথাই স্থান পায় নাই।

এইরূপে তিনি শ্বশুরগৃহে থাকিয়া সেই বিষম কথা ভাবিতে লাগিলেন। দিন গণিতে গণিতে সেই ভীষণ দিন নিকটবর্ত্তী হইল। আর তিন দিনমাত্র আছে। সাবিত্রী অনশন ব্রত আরম্ভ করিলেন। চতুর্থ দিবসে স্বামীর পরলোক গমন হইবে। তিনি ত্রিরাত্র-ব্রত উদ্দেশ করিয়া, দিবানিশি উপবাস করিতে লাগিলেন। সঙ্কল্প—স্বামীকে পরলোক গমন করিতে দিব না। তাঁহার ব্রতের কথা শুনিয়া শ্বশুর দ্যুমৎসেন মহা চিন্তাকুল হইয়া বলিলেন—'মা, তুমি বড় কঠিন ব্রত অবলম্বন করিয়াছ,

তিন দিন তিন রাত্রি উপবাস করিয়া থাকিতে পারিবে না। শ্বশুরকে কাতর দেখিয়া তিনি বলিলেন—'হে তাত! আপনি সন্তাপ করিবেন না, আমি ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিব। নিশ্চল উৎসাহ ব্যতীত ব্রত উদ্‌যাপন করা যায় না; আমিও অবিচলিত উৎসাহ সহকারে ইহা অবলম্বন করিয়াছি।'

যেমন বধূ তেমনি শ্বশুর। দ্যুমৎসেন বলিলেন—'তুমি ব্রত ভঙ্গ কর, এমন কথা আমি তোমাকে কিছুতেই বলিতে পারিব না; মা, তুমি ব্রত উদ্‌যাপন কর, ইহা ভিন্ন আর কিছু তোমাকে বলা আমার উচিত নয়।'

তিন দিন তিন রাত্রি সে দেহে এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত গেল না—তখন সে দেহ কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ হইল। তাঁহাকে দেখিয়া শ্বশুর শ্বশ্রূ চতুর্থ দিবসে আরও কাতর হইয়া বলিলেন—'মা, তুমি যথানিয়মে ব্রত সম্পন্ন করিয়াছ, এখন আহার কর।'

কিন্তু যে কঠিন সঙ্কল্প করিয়া তিনি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তখনও সিদ্ধ হয় নাই, রজনীতে তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে। তিনি বলিলেন—'কামনা করিয়া ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক আমি সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সূর্য্য অস্তগত হইলে তবে ভোজন করিব।' এমন সময়ে পতিব্রতা দেখিলেন, কাষ্ঠাদি আহরণার্থ কুঠার হস্তে লইয়া পতি বনে গমন করিতেছেন। তিনি শ্বশুর শ্বশ্রূর অনুমতি লইয়া পতির সহিত বনে গমন করিলেন।

এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। আজ সেই ভীষণ দিন। সন্ধ্যা



আগত প্রায়—সেই ভীষণ মুহূর্ত্তও আগত প্রায়। পতির সহিত পতিব্রতা বনে প্রবেশ করিয়াছেন। সাবিত্রীর হৃদয় তখন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল ; বিদীর্ণ হইবারই কথা, তথাপি তিনি হাসিতে হাসিতে যাইতেছিলেন। সত্যবান্ কিছুই জানিতেন না, সাবিত্রী তখনও তাঁহাকে কিছু বলেন নাই। তিনি বনের শোভা দেখিয়া মোহিত হইয়া সাবিত্রীকে 'পুণ্যজননী নদী ও পুষ্পিত শৈলোত্তম সমস্ত' দেখিতে বলিলেন। সাবিত্রীর তখন বনশোভা দেখিবার সময় নয়, তাঁহার তখন মনে হইতেছে, যেন পতির মৃত্যু হইয়া গিয়াছে—তথাপি তিনি আপন হৃদয়কে যেন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগে সেই ভীষণ মুহূর্ত্তের ভাবনা লুকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন ; অপর ভাগে আনন্দের সৃষ্টি করিয়া পতির সহিত অরণ্যের রমণীয়তার কথা কহিতে লাগিলেন। এ মনের শক্তি সামর্থ্য ও পরিসর—এ চিত্তের বিশুদ্ধতা, বিকারবিহীনতা ও গভীরতা—সমস্তই কল্পনাতীত। ইহার কিছুরই আমাদের ধারণা হয় না।

কিন্তু এ মনের আরো শক্তি, আরো সামর্থ্য, আরো পরিসর আছে। এতক্ষণ যাহা দেখা গেল, তাহা দিবালোকে বনের শোভা দেখিতে দেখিতে সুস্থ বলিষ্ঠ আনন্দোৎফুল্ল সত্যবানের সঙ্গে থাকিয়া দেখা গেল। এইবার বড় ভিন্ন রূপ, বড় বিপরীত প্রকার দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে—দিবালোক চলিয়া গিয়াছে, মহারণ্য মহান্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছে, সত্যবান্ সহসা মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। নারদ-কথিত সেই ভীষণতম

মুহূর্ত্ত আসিয়াছে। সাবিত্রী দেখিলেন—যাঁহার নামে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁপে, সেই 'রক্তবস্ত্রপরিধায়ী, বদ্ধমুকুট, দীর্ঘকায়, লোহিতলোচন ভয়ঙ্কর পুরুষ' তাঁহারই পতিকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহারই সম্মুখে দণ্ডায়মান। তথাপি তিনি যেমন তেমনি! সম্মুখে ভীষণতার ভীষণতম মূর্ত্তি, চারিপার্শ্বে ভীষণতার ভীষণতম সমাবেশ, তথাপি তিনি যেমন তেমনি! তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, কাঁপিয়া উঠিবারই কথা, ভাঙ্গিয়া যায় নাই ইহাই আশ্চর্য্য, অন্য হৃদয় হইলে ভাঙ্গিয়া যাইত। তিনি কিন্তু আপনাতে আপনি এমনি সংযত যে, তৎক্ষণাৎ উঠিতে হইবে, তথাপি ভয়ে পতির মস্তক ক্রোড় হইতে ফেলিয়া না দিয়া, পাছে তাহাতে একটু আঘাত লাগে, এই জন্য ধীরে—অতি ধীরে তাহা নামাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ধীরে, অতি ধীরে—তখনও ধীরে, অতি ধীরে—স্বামী সহসা কালনিদ্রাভিভূত, সহসা সম্মুখে মহাকাল—তথাপি ধীরে, অতি ধীরে—এ কি ব্যাপার! মানুষের মনে ইহার ধারণা হয় না।

সাবিত্রী যেমন মনোময়ী, যেমন চিন্ময়ী, তেমনি জ্ঞানময়ী। তাঁহার যে প্রকৃতির মন, তাঁহার যে প্রকৃতির চিত্ত, তাহাই জ্ঞানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আধার, জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানোন্মেষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। যেখানে শরীর প্রবল, সেখানে মন বা চিত্তে জ্ঞানোন্মেষ কঠিন হয়; যেখানে শরীর অপ্রবল, সেখানে মনে বা চিত্তে জ্ঞানোন্মেষ সহজ ও স্বাভাবিক। ইন্দ্রিয়াদির দমন যে জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করিবার প্রথম প্রক্রিয়া বা অনুষ্ঠান-

স্বরূপ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার অর্থই এই। সাবিত্রী অশরীরী; সুতরাং তাঁহার মন বা চিত্ত জ্ঞানোন্মেষের প্রশস্ততম ক্ষেত্র, জ্ঞানের অত্যুৎকৃষ্ট লীলাস্থল। যমের সহিত কথোপ-কথনে তাঁহার জ্ঞানের বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা, সূক্ষ্মতা এবং গভীরতা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। যমের ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় না, ব্রহ্মজ্ঞানে তিনি বিভোর। সাবিত্রী সেই যমকে জ্ঞানের কথায় মোহিত করিয়া, জ্ঞানের কথায় উন্মত্ত করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে অমূল্য বর লাভ করিয়াছিলেন এবং মৃত পতিকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার একটি কথা শুনিয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপা যম বলিয়াছিলেন, তুমি যেরূপ কথা বলিলে, সেরূপ কথা আর কাহার কাছে শুনি নাই। জ্ঞান-ময়ীর জ্ঞানের কত উচ্চতা, গভীরতা ও পবিত্রতা, যমকে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, মহাভারত পাঠ করিলে তাহা বুঝা যায়। তন্মধ্যে একটি মাত্র কথা—সাধুর মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য-বিষয়ক—একটি মাত্র কথা এ স্থলে উদ্ধৃত করিব—

"সাধুলোকদিগের সনাতন ধর্ম্মেই সদাকাল আসক্তি থাকে; সাধুলোকেরা অবসন্ন বা ব্যথিত হন না; সাধুলোক-দিগের সাধুসঙ্গ কদাচ নিষ্ফল হয় না এবং সাধুলোকেরা সাধু-কুল হইতে ভয় সম্ভাবনাও করেন না। হে রাজন্! সাধুরাই সত্যপ্রভাবে সূর্য্যকে পরিচালিত করেন; সাধুরাই তপোবলে পৃথিবীকে ধারণ করেন; সাধুরাই প্রাণিগণের কল্যাণের গতি; অতএব সাধুদিগের মধ্যে থাকিয়া সজ্জনেরা অবসন্ন হন না।

এই চিরন্তন ব্যবহার আর্য্যগণের আচরিত, ইহা বিশেষরূপে জানিয়া, সাধুরা পরার্থসাধন করিয়া প্রত্যুপকারের প্রতীক্ষা করেন না। সৎপুরুষগণের প্রসাদ ব্যর্থ হয় না, কার্য্য নষ্ট হয় না এবং মানেরও হানি হয় না ; সাধুগণ সম্বন্ধে এই নিয়ম যখন নিত্যপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তখন সাধুরাই রক্ষাকর্ত্তা হন।"

সাবিত্রী তেজোময়ী। সাবিত্রীর রূপের গর্ব্ব, পিতৃধনের গর্ব্ব, কিছুই ছিল না। দরিদ্রের বধূ হইয়াই তিনি পিতৃ-প্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া বল্কল-কাষায় পরিধান করিয়াছিলেন। শ্বশুর শাশুড়ীর যেমন সেবা করিতে হয়, সাবিত্রী তাঁহাদের তেমনি সেবা করিতেন। পতির যেমন করিয়া প্রীতি সাধন করিতে হয়, সাবিত্রী তেমনি করিয়া তাঁহার প্রীতি সাধন করিতেন। শুধু আপন শ্বশুর শ্বশ্রূ ও পতি নয়, আশ্রম-প্রদেশে অপর যাঁহারা ছিলেন, সাবিত্রী তাঁহাদের প্রত্যেকের অভিলাষানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা তুষ্টি সম্পাদন করিতেন। সাবিত্রী অপূর্ব্ব বিনয়ের সহিত সকলের সহিত কথা কহিতেন। সাবিত্রীকে আশ্রমপ্রদেশের সকলেই ভক্তি করিত ও ভালবাসিত। আর সেই সত্যযুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত ভারতে সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিয়াছে এবং ভালবাসি-য়াছে। গুরুজনের নিকট সাবিত্রী সম্ভ্রম ও নম্রতার আদর্শ-রূপিণী। পিতার নিকট আসিয়া, তিনি তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া যোড়হস্তে একটি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকেন কিন্তু সেই পিতা যখন তাঁহাকে অন্য বর অন্বেষণ করিতে বলিয়াছিলেন,

তখন তিনি এক অন্তর্নিহিত শক্তিতে শক্তিশালিনী হইয়া, গম্ভীরভাবে দৃঢ়তাসহকারে উত্তর করিয়াছিলেন—আমি যাঁহাকে একবার পতিরূপে বরণ করিয়াছি, তিনি দীর্ঘজীবী হউন আর নাই হউন, গুণবান্ হউন আর নাই হউন, তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও বরণ করিব না। ইহাই প্রকৃত তেজ। এ তেজের উৎপত্তি ধর্ম্মে। তাঁহার কঠোর ধর্ম্মনিষ্ঠা, অসাধারণ মানসিক একাগ্রতা, বজ্রকঠিন প্রতিজ্ঞা দেখিয়া ত্রিভুবন স্তম্ভিত হয়। এমন নির্ভীকতা, অতুলনীয় পাতিব্রত্য—ইহাই সাবিত্রীর তেজস্বিতার নিদর্শন। শেষোক্ত নিদর্শনের কথা একটু বলিব। সত্যবানের সূক্ষ্ম শরীর লইয়া যাইতে যাইতে যম যতবার সাবিত্রীকে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন, ততবারই সাবিত্রী পাতিব্রত্য ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া, দৃঢ়তা সহকারে ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। প্রথম বারের অনুরোধে তিনি বলিয়াছিলেন—আমার স্বামী এবং আপনি যে স্থানে যাইতেছেন, ধর্ম্মানুসারে আমারও সেই স্থানে যাওয়া কর্ত্তব্য; আমার পতি যে স্থানে যাইতেছেন, তপস্যা, গুরুভক্তি, পতিস্নেহ এবং আপনার অনুগ্রহবলে আমি তথায় যাইবই যাইব। আপনার অনুগ্রহে আমার গতি অপ্রতিহত হইবে। এই যে যমের অনুগ্রহের কথা, ইহা সাবিত্রীর তেমন মনের কথা নয়। তাহার মনের কথা—আমার তপস্যা, গুরুভক্তি ও পাতিব্রত্যের বলে আমি যাইব, যম আমার গতি রোধ করিতে পারিবেন না। তবে আবার যে যমের অনুগ্রহের কথাও বলিয়াছিলেন, সে তাঁহার তেজস্বিতার সহিত

যে অপূর্ব্ব নম্রতা ও শিষ্টতা মিশ্রিত ছিল, তাহারই রমণীয় নিদর্শন।

যম একটি একটি করিয়া তিন চারিটি বর দিয়াছিলেন। যখন সাবিত্রীকে বর ভিক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, তখনই মৃত পতির জীবন ভিন্ন অন্য বর চাহিতে বলিয়াছিলেন। শেষে কিন্তু তাঁহাকে সেই মৃত পতির জীবন পর্য্যন্ত দিতে হইয়াছিল —সাবিত্রীর অপূর্ব্ব পাতিব্রত্যের হুঙ্কারে এক প্রকার অভিভূত হইয়া, পতিব্রতাকে তাঁহার মৃত পতির জীবন দান করিতে হইয়াছিল। এই সে হুঙ্কার—

"হে মানপ্রদ! আপনি আমার পুণ্যব্যতিরেকে যেমন অন্য অন্য বর প্রদান করেন নাই, সেইরূপ এই বরটিও পুণ্যব্যতিরেকে প্রদান করিতেছেন না; অতএব আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, এই সত্যবান্ জীবিত হউন, যেহেতু পতি ব্যতিরেকে আমি মৃতার ন্যায় রহিয়াছি। আমি পতি-বিহীনা হইয়া সুখ কামনা করি না, পতি-বিহীনা হইয়া ঐশ্বর্য্য কামনা করি না, পতি-বিহীনা হইয়া জীবনধারণেও উৎসাহ করিতে পারি না। দেখুন, আপনিই আমার শত পুত্র হইবার বর প্রদান করিলেন, অথচ আমার পতিকে হরিয়া লইয়া যাইতেছেন; অতএব আমি বর প্রার্থনা করিতেছি, এই সত্যবান্ জীবিত হউন, তাহাতে আপনারই বাক্য সত্য হইবে।"

বড় মিষ্ট কিন্তু বড় শক্ত তিরস্কার। এ মেয়ের পাতিব্রত্যের কি তেজ!

সাবিত্রী অশরীরী—তিনি মানবজগতের অত্যুচ্চ স্তরবাসিনী। সে স্তরে আর কেহ আছেন কি না, যদি থাকেন, কে কে আছেন, এস্থলে তাহা ঠিক করিতে পারিব না—তাহা ঠিক করিবার স্থান ইহা নহে। কিন্তু মানবজগতের উচ্চতম স্তরে থাকিয়াও সাবিত্রী মানবজগতের সংসাররূপ নিম্নস্তরে আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে পরম ধর্ম্মসাধন জ্ঞানে মিশাইয়া রাখিয়াছিলেন। সংসারে তিনিই সর্ব্বলোকের সুখসন্তোষ-বিধায়িনী, শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রভৃতির শুশ্রূষাকারিণী এবং শ্বশুরকুল, পিতৃকুল ও পতির রক্ষাকারিণী হইয়াছিলেন। গুরুজনের সেবা এবং সকলের তুষ্টিসাধন অতি গুরুতর কর্ত্তব্য বুঝিয়া সাবিত্রী কায়মনোবাক্যে তাহাতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এ বড় সুন্দর অত্মোৎসর্গ। যেখানে মন বড় উচ্চ, সেইখানেই সংসারে এইরূপ আত্মোৎসর্গ হইয়া থাকে। মানবজগতের উচ্চস্তরের জন্যই উহার নিম্নস্তর মনুষ্যের বাসের উপযোগী হয়, পবিত্রতাপরিবর্দ্ধক পবিত্র আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে পরিপূরিত হয়, মনুষ্যের উন্নতির সোপানস্বরূপ হয়, নচেৎ ঐ নিম্নস্তর হিংস্র শ্বাপদ পিশাচাদির অধিকৃত স্তরের সমান হইয়া পড়ে। মানবজগতের উচ্চতম ও নিম্নতম স্তরের সংযোগ অত্যাবশ্যক। ঐ দুই স্তরের সংযোগ সম্মিলন ও সংমিশ্রণেই মানবজগতের সম্পূর্ণতা। সাবিত্রী ব্রহ্মার পূর্ণ সৃষ্টি।

ব্রহ্মার পূর্ণ সৃষ্টি বলিয়াই সাবিত্রী সংসারে পূর্ণতা সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারই অলোকসামান্য গুণে তাঁহার শ্বশুরকুল বিপন্মুক্ত হইয়া রক্ষিত ও হৃতরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল, তাঁহারই শুভকারিতায় তাঁহার পিতৃকুল রক্ষিত হইয়াছিল, তাঁহারই অসীম আয়াসে তাঁহার পতি মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিয়াও রক্ষা পাইয়াছিলেন। সংসার করিবার দোষে নারীই সংসার নষ্ট করেন। সংসার করিবার গুণে নারীই সংসার রক্ষা করেন। যে নারী আপনাকে ভুলিয়া সংসারের ভাবনা যত ভাবেন, সংসারের সেবায় যত আত্মোৎসর্গ করেন, অভাবে অনটনে আপদে বিপদে তিনি তত সংসার রক্ষা করিতে পরেন। সংসারে সাবিত্রী সকল দিক্ রক্ষা করিয়াছিলেন। সাবিত্রী সংসাররূপিণী।

সাবিত্রী মানবী—মানবীর অনির্ব্বচনীয় কোমলতা, নম্রতা, শুশ্রূষাপ্রিয়তা, লজ্জাশীলতাদি তাঁহাতে দেখিতে পাই। কিন্তু তাঁহার অশরীরিত্ব, চিন্ময়তা, মনোময়তা, তেজস্বিতা, অমানুষিক শক্তিমত্তাদি দেখিলে মনে হয়, মানব-জগতের যে স্তরে তিনি বাস করেন, তথায় বুঝি অন্য মানবী আর নাই—সে স্তর বুঝি মানব-জগতের ঊর্দ্ধস্থিত দেবাধিকৃত কোন স্তরের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে! তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয় না, ভারতে বোধ হয় এমন নর-নারী নাই। কিন্তু তাঁহার কাছে সকলেই সম্ভ্রমে সন্ত্রস্ত। অমন অশরীরিত্ব, অত শক্তিমত্তা, অত তেজস্বিতা, অত বিশুদ্ধতা, অত মনোময়তা, অত জ্ঞানময়তা, অত পবিত্রতার অধিক সান্নিধ্যে গমন করিতে সকলেই যেন সঙ্কুচিত। সীতা, শকুন্তলা, দ্রৌপদী, দময়ন্তী—সকলেরই কথা সকলে সর্ব্বদাই কয়—সভায় কয়, সাহিত্যে কয়, সঙ্গীতে কয়। কিন্তু সভা,

সাহিত্য, সঙ্গীত—কোথাও সাবিত্রীর কথা কেহ প্রায় কয় না। তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সকলেই যেন সঙ্কুচিত, কেহই যেন সাহস করে না। তিনি রমণী, কিন্তু তাঁহার মতন রমণী বোধ হয় আর নাই।

মহর্ষি কণ্ব।

—:*:—

[মহানুভবতা।]

কণ্ব একজন প্রখ্যাতনামা ঋষি। তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, পার্থিব সুখ তুচ্ছ করিয়া, দুর্দ্দমনীয় ভোগ-লালসা বিনষ্ট করিয়া, দেহ মন আত্মা সকলই ব্রহ্ম-সেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন। পৃথিবীর সুখ, পৃথিবীর সম্পদ্, পৃথিবীর যশ, পৃথিবীর মর্য্যাদা, পৃথিবীর গৌরব, ইহার কিছুই তাঁহার প্রার্থনীয় বলিয়া বোধ হয় না। এ সকলই তাঁহার কাছে সামান্য, মূল্যহীন, অকিঞ্চিৎকর। তাঁহার দৃষ্টি স্বর্গাভিমুখে। পার্থিব পদার্থ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে, কিন্তু তিনি পার্থিব পদার্থের নিকট নাই, পার্থিব পদার্থের শাসন অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি দিবারাত্র ঈশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত। যজ্ঞ, ধ্যান, আরাধনা ইহাই তাঁহার কার্য্য—ইহাতেই তাঁহার সুখ ও অভিলাষ। তাঁহার

চিন্তা ব্রহ্ম-বিষয়ক, তাঁহার হৃদয় ব্রহ্ম-আরাধনায়, তাঁহার আশা ব্রহ্মপদে। ব্রহ্মবলে তিনি বলিয়ান্। তিনি দুষ্মন্তের ন্যায় বীরপুরুষ নন; ক্ষত্রিয় যোদ্ধার ন্যায় তাঁহার বাহুবল নাই; তিনি শস্ত্রবিদ্যার অধিকারী নন। তথাপি তিনি দুষ্টদমনে সক্ষম। তাঁহার আশ্রমের সন্নিকটস্থ প্রর্ব্বতপ্রদেশে রাক্ষস নামধেয় অনার্য্যজাতির বাসস্থান। রাক্ষসেরা দলবদ্ধ হইয়া সময়ে সময়ে আশ্রমবাসীদিগের যজ্ঞকার্য্যের এবং তপশ্চর্য্যার বিঘ্নোৎপাদন করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে থাকেন, তখন তাহারা আশ্রমবাসীদিগের বৈরিতাচরণে সাহসী হয় না। কণ্বের কি প্রতাপ! তিনি উপস্থিত থাকিলে দুরন্ত বলবিক্রমশালী রাক্ষসেরাও তাঁহার আশ্রমের নিকট আসিতে সমর্থ হয় না। তাঁহার বাহুবল নাই। কিন্তু তাঁহার এমন কোন আধ্যাত্মিক বল আছে, যাহার কাছে বাহুবলপ্রধান দুরাচারগণ মন্ত্রাহতের ন্যায় হৃতসাহস এবং নির্বীর্য্য। কথাটি কাল্পনিক নয়। আধ্যাত্মিক তেজের দ্বারা দৈহিক শক্তির অপনয়ন আমরা সকলেই স্বল্প পরিমাণে দেখিয়া থাকি। মহর্ষি কণ্ব আধ্যাত্মিক শক্তির পূর্ণায়ত প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার কাছে অসংখ্য দৈহিকবলপ্রধান রাক্ষস যে মন্ত্রাহত বিষধরের ন্যায় নির্জীব হইয়া থাকিবে, তাহা অসম্ভব নয়।

কণ্ব ধীর এবং গম্ভীরস্বভাব। ইহা তাঁহার আধ্যাত্মিকতার এবং চিন্তাশীলতার ফল। তাঁহার চিন্তাশীলতার একটু পরিচয় প্রদান করি। তাঁহার পালিতা কন্যা শকুন্তলা আশ্রম হইতে পতি-

গৃহে যাত্রা করিতেছেন। এক সরোবরের ধারে আসিয়া তাঁহার শিষ্য শার্ঙ্গরব তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহার আর শকুন্তলার সঙ্গে সঙ্গে আসা কর্ত্তব্য নয়। তখন কণ্ব একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া মনে করিলেন যে, দুষ্মন্তকে পাঠাইবার উপযুক্ত একটি সম্বাদ স্থির করা আবশ্যক হইতেছে। এই মনে করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। বেদ, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রসকল যিনি মন্থন করিয়াছেন, তিনি আবার চিন্তা করিতেছেন যে, কিরকম কথা বলিয়া পাঠাইব! ধীর এবং গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি ভিন্ন কেহই এ রকম করেন না। চিন্তা করিয়া মহা ঋষি দুষ্মন্তকে এই কথা বলিতে শার্ঙ্গরবকে উপদেশ দিলেন—'আমরা তপোধন, আমাদিগকে চিন্তা করিয়া, তোমার উত্তমবংশকে চিন্তা করিয়া, আর সুহৃৎ-স্বজনেরা যাহা কোনরূপে ঘটাইয়া দেয় নাই, তোমার প্রতি শকুন্তলার সেই স্নেহপ্রবৃত্তি চিন্তা করিয়া, তুমি তোমার ভার্য্যাগণের মধ্যে সমান আদরে এই শকুন্তলাকে দেখিবে। ভাগ্যে থাকে ইহা অপেক্ষা অধিক হইবে, বধূ-বন্ধুগণের তাহা বলা উচিত হয় না।'

যেমন মহাপুরুষ, কথাও তেমনি মহত্ত্বপূর্ণ। শকুন্তলা কণ্বের প্রাণবায়ু। কিন্তু তিনি শকুন্তলার নিমিত্ত কি রকম সুখের কামনা করিলেন? তিনি এমন কামনা করিলেন না যে, দুষ্মন্ত তাঁহাকে মহিষী-শ্রেষ্ঠ করেন এবং অন্যান্য ভার্য্যা-অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। এত স্নেহের বস্তুর নিমিত্ত সেই কামনাই স্বাভাবিক এবং আর কেহ হইলে সেই কামনাই করিত। কিন্তু

তিনি তাহা করিলেন না; সে কামনা অন্যায়, অবিচার, পক্ষপাতমূলক। শকুন্তলা তাঁহার আদরের বস্তু। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার মত মহাপুরুষ শকুন্তলার সুখের অভিলাষী হইয়া অপরের ক্ষতি এবং অনিষ্ট কামনা করিতে পারেন না। ধার্ম্মিক মহাপুরুষেরা স্বার্থপরবশ হইয়া মোহান্ধ হন না; ধর্ম্মের নামে তাঁহাদের মোহজাল অদৃশ্য হইয়া যায়। তাঁহাদের চিন্তা সকল সময়েই ন্যায়মূলক। ন্যায়ানুবর্ত্তিতা উচ্চ পরিশুদ্ধ চিন্তার প্রধান এবং প্রকৃত লক্ষণ।

কণ্বের চিন্তার আর একটি রমণীয় উপকরণ আছে—সেটি তাঁহার শকুন্তলার প্রতি উপদেশে প্রকাশ। সে উপদেশ এই—'তুমি এস্থান হইতে ভর্ত্তৃকুলে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিও, সপত্নীগণের প্রতি প্রিয়সখীবৎ ব্যবহার করিও, অপমানিত হইলেও পতির প্রতিকূলচারিণী হইও না, পরিচারকদিগের উপর অধিক অনুকূল হইও, এবং সৌভাগ্যকালে গর্ব্বিত হইও না। যুবতীরা এই রূপে গৃহিণী পদ পায় আর যাহারা ইহার বিপরীতাচরণ করে, তাহারা পতিকুলের যাতনাস্বরূপ হইয়া থাকে।' উদ্ধৃত বাক্যের বিশেষ গৌরব এই যে, ইহার দ্বারা স্বার্থপরতার অপলাপ উপদিষ্ট হইয়াছে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, গুরুজনের প্রতি সম্ভ্রম—ইহার অর্থ, আত্মগরিমার সম্পূর্ণ অপচয়। পতিকর্ত্তৃক অপমানিত হইলেও তাঁহার প্রতিকূলাচরণ না করা—ইহার অর্থ, শ্রেষ্ঠ এবং প্রিয়ব্যক্তির অনুরোধে আত্মাভিমান পরিত্যাগ করা। পরিচারকদিগের

উপর অধিক অনুকূল হওয়া—ইহার অর্থ, দরিদ্র উপকারকের উপকার করা। সৌভাগ্যকালে গর্ব্বিত না হওয়া—ইহার অর্থ, অপরের সহিত তুলনায় আপনাকে বড় মনে না করা। আর সপত্নীর প্রতি প্রিয়সখীবৎ ব্যবহার করা—ইহার অর্থ, শত্রুকেও ভালবাসা। এখন দেখ, এস্থলে যে কয়টি গুণের প্রশংসা করা হইয়াছে তাহা এই :—সম্ভ্রম, ঈর্ষার পরিবর্ত্তে প্রেম, সহিষ্ণুতা, দয়া এবং নম্রতা। অতঃপর এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এই গুণগুলি থাকিলে কেবল কুলবধূ কেন, সকল লোকেই সর্ব্বত্র জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতে পারে। বাস্তবিক কণ্ব একটি কুলবধূকে যে উপদেশ দিয়াছেন, সে উপদেশ সমস্ত মানবজাতির সংসারধর্ম্মের মূলমন্ত্র। ইহাকেই বলে সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান্ এবং সর্ব্বতোমুখ শিক্ষা।

ফলতঃ কণ্বের হৃদয় একটি আশ্চর্য্য পদার্থ। সকল বস্তু, সকল জীব, সমস্ত জগৎ তাঁহার স্নেহ এবং আদরের জিনিস। শকুন্তলাকে বিদায় দিবার কালে তিনি আশ্রমের তরুলতা প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'তোমাদিগকে জল না দিয়া যে জলপান করে না—সৌন্দর্য্যপ্রিয়া হইয়াও যে স্নেহ-বশতঃ তোমাদের একটি পল্লব লয় না—তোমাদের পুষ্পো-দ্গমের কাল উপস্থিত হইলে যে আনন্দে উৎফুল্ল হয়—সেই শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাইতেছে, তোমরা অনুমতি প্রদান কর।' ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে মহর্ষি কণ্ব তরু-লতাকে কত ভালবাসেন এবং তরুলতার নিমিত্ত কত ভাবেন।

তিনিই ত শকুন্তলাকে তরুলতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যেমন তরুলতার প্রতি, তেমনি পশু-পক্ষীর প্রতিও তাঁহার স্নেহ এবং মমতা। তিনি আশ্রমের সমস্ত মৃগ-মৃগী এবং মৃগশাবকের ইতিহাস জানেন। পতিগৃহে যাইবার সময় যখন শকুন্তলার পশ্চাদ্ভাগ হইতে তাঁহার পুত্রসম মৃগটি তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া টানিল, তখন তিনিই ত শকুন্তলাকে বলিলেন,—'বৎসে! যাহার মুখ কুশাগ্রদ্বারা বিদ্ধ হইলে তুমি ক্ষতশোষক তৈল সেক করিতে, তুমি যাহাকে শ্যামাক ধান্যমুষ্টি দিয়া পোষণ করিয়াছ, সেই কৃতক পুত্র মৃগ তোমার অনুসরণ করিতেছে।' এত খবর যিনি রাখেন এবং এমন করিয়া যিনি পশু-পক্ষার কথা বলেন, পশু-পক্ষী যথার্থই তাঁহার হৃদয়ের বস্তু—তিনি যথার্থই পশু-পক্ষীর পিতা-মাতার স্থানীয়।

কণ্ব সংসারত্যাগী, বিষয়বাসনাশূন্য, পার্থিবতাপরিমুক্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মসর্ব্বস্ব, ঊর্দ্ধদর্শী। তিনি পৃথিবীর কিছুই চাহেন না, কিন্তু পৃথিবীর কীটাণুকীটও তাঁহার কাছে আদৃত ও সম্মানিত। তাঁহার দৃষ্টি স্বর্গাভিমুখে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পৃথিবীও তাঁহার স্বর্গের অন্তর্ভূত। অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী—আশ্চর্য্য বৈরাগী!

খ। জীবনী

চন্দ্রনাথ বসু।

—•:•:•—

সন ১২৫১ সালের ১৭ই ভাদ্র হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন হরিপাল থানার অন্তর্গত কৈকালাগ্রামে আমার জন্ম হয়। আমার পিতা ৺সীতানাথ বসু, পিতামহ ৺কাশীনাথ বসু। ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান্ হিন্দু বলিয়া সে অঞ্চলে আমার পিতামহের বড় প্রসিদ্ধি ছিল। পিতৃদেবকে পিতামহের পদাঙ্কানুসরণ করিতে দেখিয়াছি। আমি তাঁহাদের কাহারও পদাঙ্কানুসরণ করিতে পারি নাই।

হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি ভাগীরথীর পশ্চিমকূলস্থিত জেলা সকল তখন অতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। কলিকাতায় পীড়া হইলে আমরা গ্রামে চলিয়া যাইতাম এবং বিনা চিকিৎসায় তথায় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিতাম, এবং মহোল্লাসে খাইয়া খেলাইয়া বেড়াইতাম। স্কুল কলেজের ছুটী হইলেই দেশে যাইতাম, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা হইত না, ছুটী ফুরাইলে একমাস দেড়মাস পরে কলিকাতায় আসিতাম, তাও একরকম কাঁদিতে কাঁদিতে। আমার পুত্র-পৌত্রাদি সে গ্রামও



স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু

ACME PRESS

দেখিল না, সে গ্রাম্য সুখের আস্বাদও পাইল না। তাহাদের জীবন অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন হইল। সে গ্রাম্য জীবন যাহাদের হইল না, বঙ্গদেশ কি জিনিস তাহারা তাহা জানিতে পারিল না। তাহারা যথার্থই হতভাগ্য।

কৈকালা তখন জনপূর্ণ ছিল। তথায় প্রায় একশত ঘর ব্রাহ্মণ এবং প্রায় চারিশত ঘর তন্তুবায় ছিল। কায়স্থ এবং অন্যান্য জাতিও অনেক ছিল। সকলেই এক রকম স্বচ্ছন্দে ছিল। কারণ, ধান চাল সস্তা ছিল এবং স্বাস্থ্যসুখে কেহই বঞ্চিত ছিল না। কৈকালায় মিহি মোটা বিস্তর কাপড় বয়ন হইত—সে বস্ত্রের বড় আদর ছিল, খুব নাম ছিল, খুব কাটৃতি ছিল। কৈকালায় প্রকৃত ধনাঢ্য তন্তুবায় ছিল। কৈকালা গ্রামে কুড়ি পঁচিশখানা পূজা হইত। কিন্তু কৈকালা আজ ম্যালেরিয়ায় প্রায় জনশূন্য। গত ৪০বৎসরে বোধ হয় শতকরা ৭৫ জন চলিয়া গিয়াছে—গ্রামে গৃহ অতি অল্পই আছে। তন্তুবায় দুই দশজন মাত্র আছে—তাহারা এখনও কাপড় বুনিতেছে, হাবড়ার হাটে তাহাদের কাপড়ের আদর এখনও আছে। কিন্তু দুই দশজন বই নয়, তাও ম্যালেরিয়ায় মৃতবৎ; কয়খানা কাপড়ই বা তাহারা বুনিবে, কয়টা টাকাই বা পাইবে? সমস্ত গ্রামে এখন একখানি মাত্র পূজা হয়—তাহাতেও ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় কুড়ি পঁচিশটির অধিক ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না। বাগ্দী দুলে সব মরিয়া গিয়াছে—তারকেশ্বর রেলরাস্তা নির্ম্মাণার্থ অন্য স্থান হইতে আনীত কুলীমজুর কোল সাঁওতাল তাহাদের

স্থান অধিকার করিয়াছে। গ্রামে জঙ্গল বাড়িয়াছে, বন্য শূকরাদি হিংস্র জন্তু দেখা দিয়াছে। ম্যালেরিয়ার জন্য প্রায় চল্লিশ বৎসর সোনার কৈকালায় যাই নাই। এতদিনের পর অবসর গ্রহণ করিলাম। আজ সেই সোনার কৈকালায় বসিয়া সেই বাল্য-সুখ উপভোগ করিব। কিন্তু তাহা আর হইল না। কি জানি কে শত্রুতা সাধন করিল—আমার সেই সোনার কৈকালা মাটী করিয়া দিল। অথবা বিধাতাই আমাদের প্রতি বিমুখ!

পঞ্চম বর্ষে যথারীতি হাতে খড়ি হইলে পর আমি পাঠশালায় প্রবেশ করি। আমাদের বাড়ীতেই পাঠশালা ছিল। উদয় নামক এক ব্যক্তি আমাদের গুরুমহাশয় ছিলেন। তাঁহার অসাক্ষাতে তাঁহাকে আমরা 'উদোমশাই' বলিতাম। তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন। সদর বাটীতে পাঠশালা বসিত। সেখান হইতে আমাদের অন্দর-বাটী কিছু দূর। মনে আছে, একদিন অপরাহ্ণে বৃষ্টি হইতেছিল বলিয়া গুরুমহাশয় একটি গোলপাতার ছাতা মাথায় দিয়া আমাকে কোলে করিয়া অন্দর-বাটীতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। আমার বয়স যখন আট বৎসর, তখন আমার পিতামহের চারি পুত্রের মধ্যে কেবল কনিষ্ঠ, আমার পিতৃদেব, বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে লইয়া কলিকাতায় বাসাভাড়া করিয়া থাকিতেন। ইংরাজী শিখাইবার জন্য তিনি আমাকে "হেদোর" স্কুলে পাঠাইয়াছিলেন। তখন আমাদের বাসা শিমলার বাজারের প্রায় সম্মুখে। সুতরাং ঐ স্কুলের অত্যন্ত নিকটে ছিল বলিয়াই

বোধ হয় তথায় পাঠাইয়াছিলেন। ছয় মাস মাত্র "হেদোর" স্কুলে রাখিয়া পিতা আমাকে ওরিয়েণ্টল সেমিনরির শাখা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। ওরিয়েণ্টল সেমিনরি স্বর্গীয় গৌরমোহন আঢ্যের প্রতিষ্ঠিত, তখন বড়ই প্রসিদ্ধ, এখন খর্ব্ব হইয়াও সুন্দর-ভাবে পরিচালিত। তখন উহার দুই তিনটি শাখা ছিল—একটি কলিকাতায় উহারই নিকটে, আর একটি ভবানীপুরে, আর একটি বেলঘরিয়ায়। মূল ও শাখা স্কুল কয়টিতে বোধ হয় দেড় হাজার বালক শিক্ষা লাভ করিত। মূল স্কুলে ইংরাজী সাহিত্যের বড়ই আদর ছিল। তজ্জন্য উহার যেরূপ প্রসিদ্ধি ছিল বোধ হয় কলিকাতার আর কোন স্কুল বা কলেজের সেরূপ প্রসিদ্ধি ছিল না। অঙ্ক ও বাঙ্গালায় তত মনোযোগ ছিল না। এণ্ট্রান্স ক্লাসে উঠিবার এক বৎসর পূর্ব্বে শাখা স্কুল হইতে মূল স্কুলে গিয়াছিলাম। তখন আমার Pope's Iliad পড়া হইয়া গিয়াছিল। মূল স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় (বিবাহবিভ্রাট-প্রণেতা আমার স্নেহাস্পদ অমৃতলালের পিতা) আমাকে এত ভালবাসিতে লাগিলেন যে, আমাদের ক্লাসের কয়েকটি ছেলে আমাকে তাড়াইবার জন্য প্রতিদিন টেবিল চাপড়াইয়া আমাকে বিদ্রূপ করিয়া গান গাহিত। আমি চুপ করিয়া শুনিতাম, একটি কথাও কহিতাম না; কৈলাসবাবুকেও কিছু বলিতাম না। তাহারা দিন কতক এইরূপ করিয়া আপনারাই পলাইয়া গেল। তখন স্কুলের স্থাপয়িতা গৌরমোহন আঢ্য লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ৺হরেকৃষ্ণ

আঢ্য মহাশয় স্কুলের অধিকারী ও অধ্যক্ষ—জ্যেষ্ঠের কীর্ত্তি রক্ষণে বড়ই যত্নশীল। উচ্চশ্রেণীতে তিনি বড় বড় ইংরাজ এবং ইউরেশীয় শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন। আর নিম্নতর শ্রেণীর শিক্ষকতার যেরূপ বন্দোবস্ত ছিল, সেরূপ বোধ হয় আর কোন স্কুলে কখন হয় নাই। বাঙ্গালী বালকের ইংরাজী উচ্চারণ প্রায়ই অশুদ্ধ হয় বলিয়া ওরিয়েণ্টল সেমিনরির নিম্নতম শ্রেণীতে একজন ইউরেশীয় শিক্ষক নিযুক্ত হইতেন। তাহাতে ছোট ছোট ছেলেরা প্রথম হইতেই শুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণ শিখিত এবং সংখ্যায় অধিক হইলেও সুশাসনে থাকিত।

যখন জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অর্থাৎ Preparatory ক্লাসে পড়ি তখন রিচার্ডসন্ সাহেব আমাদিগকে দুই এক দিন পড়াইয়া ছিলেন। এণ্ট্রান্সের পাঠ্যের মধ্যে Rogers's Pleasures of Memory নামক কাব্য ছিল। প্রথম দিন সাহেব Rogers Goldsmith, Campbell, Akenside, Thomson প্রভৃতি descriptive কাব্যপ্রণেতাদিগের দোষ গুণ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তেমন কথা আর কখনও শুনি নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কাছে দুই চারি দিনের বেশী পড়া হয় নাই—তিনি বিলাতে চলিয়া গেলেন। দুই দিনেই কিন্তু বুঝিয়াছিলাম যে, ইংরাজী সাহিত্যের তাঁহার মতন অধ্যাপক বঙ্গে আর আসেন নাই।

আমাদের একটি ক্লব ছিল—নাম ওরিয়েণ্টল ডিবেটিং ক্লব।

কেবল ছাত্রদিগের ক্লব। আমরা আপনারাই পর্য্যায়ক্রমে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিতাম এবং আপনারাই তর্ক বিতর্ক করিতাম। বার্ষিক অধিবেশনেও আমরাই প্রবন্ধ পাঠ করিতাম।

ইং ১৮৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হই। কেমন করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই, অঙ্কে ও বাঙ্গালায় এতই কাঁচা ছিলাম। উত্তীর্ণ হইবার পর স্থির হইল যে, আমাকে কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হইয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে হইবে, পিতৃদেব মাসে দশটাকা করিয়া বেতন দিয়া আমাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াইতে পারিবেন না। কিন্তু বিধাতা একটু অনুকূল হইলেন। Atkinson সাহেব তখন শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বা অধ্যক্ষ। তিনি বড় উদারচেতা ছিলেন। হরেকৃষ্ণবাবুকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ একটি ছাত্রকে আট টাকা মূল্যের একটি ছাত্রবৃত্তি দিবেন। হরেকৃষ্ণবাবু আমাকে তাঁহার বাটীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সাশ্রুলোচনে ঐ কথা বলিলেন। ১৮৬১ সালের প্রারম্ভেই আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ৺প্যারীচরণ সরকার আমাদিগকে ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়াইতেন। অতি অল্প অধ্যাপককেই তাঁহার ন্যায় যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া পড়াইতে দেখিয়াছি। প্রতি সপ্তাহে দুই দিন করিয়া তিনি আমাদিগকে ইতিহাসের প্রশ্ন দিতেন, আমরা বাড়ী হইতে উত্তর লিখিয়া লইয়া যাইতাম, তিনি সেই সকল

আশিখানা উত্তর সাবধানে সংশোধন করিয়া ফিরাইয়া দিতেন। Carnduff নামক একজন অধ্যাপক মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে লেখাইতেন। শুনিতে পাই ঐ রূপ লেখাইবার প্রথা এখন আর নাই। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যাপক কাউয়েলের নিকট পড়িয়াছিলাম। তেমন অধ্যাপক বুঝি আর হয় না—পাণ্ডিত্য যেমন বহু বিষয়ব্যাপক তেমনই প্রগাঢ়, ছাত্রের প্রতি স্নেহ ও যত্ন বর্ণনাতীত। ১৮৬২ সালে ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে পঞ্চম স্থান লাভ করিয়াছিলাম—প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন রাসবিহারী (স্যার রাসবিহারী ঘোষ কে. টি., এম. এ, ডি. এল)। যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন ওরিয়েণ্টল ডিবেটিং ক্লবের ন্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজেও আমাদের একটি ক্লব ছিল। ঐ ক্লবেও আমরা আপনারাই প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিতাম, আপনারাই তর্ক বিতর্ক করিতাম, বাহিরের লোক আনিতাম না। যখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি তখন আমরা Calcutta University Magazine নামক এক খানি ইংরাজী মাসিক পত্র বাহির করিয়াছিলাম। আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ হোসেন বেলগ্রামি, যিনি এখন নিজামের রাজ্যে শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ, উহার এক জন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ঐ পত্রে On the Importance of the Study of History নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তৎসম্বন্ধে Englishman সম্পাদক লিখিয়াছিলেন—We trust this article is from a

native pen, though we doubt it, আর বলিয়াছিলেন যে উহাতে খুব originality of thought ছিল। কাগজখানি পনর মাসের অধিক স্থায়ী হয় নাই। তাহাও কেবল ৺প্যারীচরণ সরকারের অনুগ্রহে হইয়াছিল। তিনি কাগজখানি আপনার প্রেসে ছাপাইয়া দিতেন। আমরা সংসারানভিজ্ঞ—মূল্য আদায়ে বিশৃঙ্খলা ঘটাইতাম। ছাপিবার ব্যয় প্রায় চারিশত টাকা দেওয়া হয় নাই, প্যারীবাবুও কখনও চাহেন নাই।

১৮৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে বি-এ পরীক্ষা দিয়া আমি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলাম, রাসবিহারী এবং মৃত অধ্যাপক ব্লকমান সাহেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু একবার আমাকে বলিয়াছিলেন—"তুমি পরীক্ষায় ব্লকমান অপেক্ষা বড় হইয়াছিলে, কিন্তু ব্লকমান আইন আকবরীর ন্যায় গ্রন্থখানা অনুবাদ করিয়া ফেলিলেন, তুমি কি কাজ করিলে?" বঙ্কিমবাবু ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন—আমরা কেবল পরীক্ষা দিতে পারি। ১৮৬৬ সালে এম্-এ এবং ১৮৬৭ সালে বি-এল্ পরীক্ষা দিয়াছিলাম। শেষোক্ত পরীক্ষায় রাসবিহারী প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি।

বি-এল্ পাস করিয়া সকলে যেমন আদালতে ছোটে, আমিও তেমনি ছুটিয়াছিলাম। চাকরী করিয়া স্বাধীনতা নষ্ট করিব না, তখন মনের ভাব এইরূপ ছিল। কিন্তু হাইকোর্টে গিয়া দেখিলাম, সেখানকার হাওয়া ভাল নয়। মামলা মোকদ্দমা

আমার ভালও লাগিত না। শীঘ্রই বুঝিলাম, অনেকে ন্যায় অন্যায়ের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বৈরসাধনার্থ অথবা জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া অর্থনাশ করে, এমন কি সর্ব্বস্বান্ত হয়, এবং সমাজে বিষম অসদ্ভাব এবং মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে। মফঃস্বল হইতে আমার নিকট মোকদ্দমা পাঠাইবার লোক ছিল না। মোক্তারদিগের খোসামোদ করিতেও পারিতাম না। ওকালতিতে কিছু হইল না দেখিয়া অগত্যা চাকরীর চেষ্টা করিতে হইল। অধ্যাপকতা করিবার ইচ্ছা হইল। তখন উড্রো সাহেব শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ। তিনি বড় সহৃদয়তা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যখন বিদায় গ্রহণ করণার্থ উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন তিনিও উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"আমি যদি তোমার পিতা হইতাম তাহা হইলে তোমাকে এ বিভাগে আসিতে নিষেধ করিতাম, এ বিভাগে কাহারও কিছু হয় না।" তিনি পাঁচ সাত দিন পরেই আমাকে কটক কলেজে দুইশত টাকা বেতনের একটি অধ্যাপকতা দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে, আমার একটি "ডিপুটী মেজেষ্টরী" পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তখন আপনিই বলিলেন—না, অধ্যাপকতা লইও না, "ডিপুটী মেজেষ্টরী"ই লও। ১৮৭৮ সালে ঢাকায় ডিপুটীগিরি করিতে যাই। ডিপুটীগিরি ভাল চাকরী বলিয়া বোধ হইল না। ছয়মাস পরে ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় আসিলাম। আসিবামাত্র ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাকে বলিলেন—"জয়পুর কলেজের প্রিন্সিপাল নাই, কান্তিবাবু আপনাকে চান, যাইবেন কি?"

আমি যাইলাম। জয়পুরের ন্যায় সুন্দর সহর ভারতবর্ষে আর নাই। একজন ইংরাজ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস ছাড়িয়া দিলে, জয়পুরের ন্যায় সুন্দর সহর পৃথিবীতে আর নাই। জয়পুর মহারাজ জয়সিংহের স্থাপিত। উহার গঠনপ্রণালী বিদ্যাধর নামক একজন বাঙ্গালীর উদ্ভাবিত। বিদ্যাধরের গলি বলিয়া জয়পুরে এখনও একটি রাজপথ আছে। জয়পুরের দেবালয়ে বাঙ্গালী পুরোহিতের সংখ্যাই অধিক। জয়পুরের রাজকার্য্যে অনেকদিন হইতে বাঙ্গালীরই প্রাধান্য। দেখিলাম কান্তিবাবুই জয়পুরের প্রকৃত রাজা। জয়পুরে বিস্তর বাঙ্গালী দেখিলাম। ৺যদুনাথ সেন মহাশয়ের বাটীতে একটি বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। বালক-বালিকা শুদ্ধ প্রায় দেড়শত বাঙ্গালী ভোজনে বসিয়াছিলাম। জয়পুরে থাকিলে অনেক টাকা করিতে পারিতাম। যে দিন সেখানে যাই তাহার পরদিনই কান্তিবাবু বলিয়াছিলেন—কলেজের কর্ম্মে কিছুই হইবে না, শীঘ্রই আপনাকে শাসনবিভাগে আনিব। কিন্তু দেখিলাম. রাজসভার হওয়া বড় ভাল নয় এবং আপন স্বাধীনতা রক্ষা করাও কঠিন। সহরটাও দেখিলাম বড় শুষ্ক ও রুক্ষদর্শন। তিন দিকে তৃণশূন্য পাহাড়, সমতল স্থান তৃণশূন্য. বারিশূন্য, বালুকাময়। আমি বাঙ্গালার ন্যায় বিশাল উদ্যানবিহারী, 'সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা' বাঙ্গালার বাঙ্গালী, জয়পুরের দৃশ্য আমার ভাল লাগে নাই। তিন মাসের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিলাম—বিধাতাকে বলিতে বলিতে আসিলাম, ঘরেই যেন

আমার যৎকিঞ্চিৎ হয়। বিধাতা কৃপা করিলেন। ছুটী ফুরাইবার অগ্রেই বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষের পদ খালি হইল। কয়েকজন ঐ পদের প্রার্থী হইলেন। স্যার আল্‌ফ্রেড ক্রফ্‌ট বলিলেন—"চন্দ্রনাথ যদি প্রার্থনা করেন, আর কেহ এ কর্ম্ম পাইবেন না।" তাঁহার কাছে আমি পড়ি নাই। তাঁহারা কিন্তু উপাধিধারীদের সংবাদ রাখিতেন। ১৮৭৯ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে আমি ঐ কর্ম্ম পাই। পাইয়া ৭ বৎসর কয়েকমাসে বিস্তর বাঙ্গালা পুস্তক পড়িয়াছিলাম। তাহার পর আমার সহোদর সদৃশ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অতি অকালে স্বর্গারোহণ করায় ১৮৮৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে আমি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হই। অনুবাদকের কাজ যেমন কঠিন, তেমনি অপ্রীতিকর, পরিমাণে প্রায় অসীম। বড় অনিচ্ছায় এই কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু গ্রহণ করিবার পর ইহাকে ধর্ম্মচর্য্যার তুল্য ভাবিয়া প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন করিয়া বিগত ১লা জানুয়ারিতে (১৯০৪) অবসর গ্রহণ করিয়াছি।

গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে বাঙ্গালা শেখা হয় নাই। প্রেসিডেন্সি কলেজে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে পণ্ডিতবর কৃষ্ণকমল বাঙ্গালা পড়াইয়াছিলেন। ভালই পড়াইয়াছিলেন। কিন্তু গোড়া কাঁচা ছিল, তাঁহার অধ্যাপনায় বিশেষ ফল পাই নাই। তিনি সংস্কৃতেও বেশ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমাদিগকে সংস্কৃত শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত আমাদের পরীক্ষার্থ নির্দ্দিষ্ট ছিল না। সুতরাং উহাতে তত মনোযোগী না

হইয়া, পাঠ্য নয় এমন ইংরাজী পুস্তক বহুল পরিমাণে পড়িতাম। ইংরাজীতে বেশী আকৃষ্ট হওয়ায় মনটাও কতক ইংরাজীভাবাপন্ন হইয়াছিল। তখন ইংরাজী লিখিয়া বড় সুখ হইত। যখন বি-এ পাস করি নাই তখন ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের Bengalee কাগজে লিখিতাম। এম্-এ পাস করাই On the Life and Character of Oliver Cromwell নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ছাপাইয়াছিলাম। এইরূপ যাহা লিখিতাম, ইংরাজীতেই লিখিতাম। বঙ্গদর্শন পড়িতে ভাল লাগিত, ইচ্ছা হইত উহাতে লিখি; কিন্তু লিখিতে সাহস হইত না। তাহার পর বাঙ্গালায় মন গেল, এবং কলিকাতা রিবিউ নামক ত্রৈমাসিক ইংরাজী পত্রে বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচনা করিতে লাগিলাম। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সমালোচনা পড়িয়া বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালা লিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন বঙ্গদর্শন সঞ্জীববাবুর হাতে। বঙ্গদর্শনে অভিজ্ঞানশকুন্তলের আলোচনা লিখিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু লিখিবার পূর্ব্বেই আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ বাল্মীকি প্রেস যে বাড়ীতে ছিল, বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদক আমার ঋষিতুল্য বন্ধু পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন সেই বাসায় থাকিতেন। তাঁহার অনুবাদকার্য্য তখন চলিতেছিল। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আমরা দুই চারিজন তাঁহার নিকট যাইতাম এবং রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত সাহিত্য শাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা করিতাম। অভিজ্ঞানশকুন্তলের আলোচনাও হইত। শকুন্তলাতত্ত্ব লিখিবার পর সরকারী কার্য্যের জন্য ভিন্ন

আর ইংরাজী লিখি নাই—লিখিতে আর ইচ্ছাও হয় নাই—এখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা হইয়াছে। লিখিতে হইলে মাতৃভাষায় লেখার ন্যায় অন্য কোন ভাষায় লেখা স্বাভাবিক ও সুখকর নয়। যখন বাঙ্গালায় লিখি তখন যাহা লিখি তাহা মূর্ত্তিমান্ দেখি; যখন ইংরাজীতে লিখি তখন যাহা লিখি তাহার এবং আমার মনশ্চক্ষুর মধ্যে যেন একখানা পর্দ্দা বিলম্বিত দেখি।

সেই সময় হইতে আমি মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। বঙ্গদর্শন, প্রচার, নবজীবন, ভারতী, সাহিত্য প্রভৃতি মাসিকপত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার প্রায় সমস্তই ক্রমে ক্রমে পুস্তকাকারে শকুন্তলাতত্ত্বে, ফুল ও ফলে, ত্রিধারায়, হিন্দুত্বে ও সাবিত্রীতত্ত্বে প্রকাশিত করিয়াছি; কঃ পন্থাঃ সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলাম। হিন্দু-সভ্যতা এবং ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে কোন্‌টি মনুষ্যোচিত, উহাতে এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছি। "বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি" নামক একটি প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে পাঠ করিয়াছিলাম। সাধু ও অসাধু দুই প্রকার বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে বঙ্গের সকল স্থানের সুবিধা ও উন্নতির জন্য এবং বাঙ্গালীর সর্ব্ব প্রকার একতাবর্দ্ধনার্থ সাধু ভাষাই অবলম্বনীয়, এই প্রবন্ধে এই মত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। হিন্দুত্বে হিন্দুর মানসিক বিশেষত্বের এবং সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছি এবং জাতিভেদ-প্রথা,' হিন্দু-বিবাহ-প্রণালী, সাকার পূজা প্রভৃতির যৌক্তিকতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র

-•:*:•—

যখন স্কুল ও কলেজে পড়িতাম, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সংস্কৃতের ব্যবস্থা ছিল না। ঐ সকল পরীক্ষায় বাঙ্গালাই তখন আমাদের “দ্বিতীয় ভাষা” ছিল। তথাপি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বড়ই অনাদর ছিল। কেবল যে বড় বড় ইংরাজীওয়ালারা উহার অবজ্ঞা করিতেন তাহা নহে; যাহা-দিগকে উহাতে পরীক্ষা দিতে হইত, তাহারাও অবজ্ঞা করিত।

বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের যখন এইরূপ আদর, তখন বঙ্কিমবাবুর নাম প্রথম শুনি। শুনি যে, তিনি বাঙ্গালাভাষায় ইংরাজী ধরণের একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালাভাষা আমি কখনই ঘৃণা করি নাই, তথাপি ঐ কথা শুনিয়া একবার মনে হইয়াছিল, এ আবার কি! এত ইংরাজী পড়িয়া বাঙ্গালায় [illegible] লেখা কেন [illegible] কিন্তু উহা ভিন্ন আর কিছুই ভাবি নাই। মনে বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব উদয় হয় নাই। ক্রমে শুনিলাম, তিনি ঐ রকম আর একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। এবার কিন্তু প্রথমবারের মত মনে বিস্ময়ের ভাব একেবারেই জন্মে নাই। বরং বাঙ্গালা ভাষার উপর আস্থা বাড়িয়াছিল। দিনকতক পরে শুনিলাম বঙ্কিমবাবু আরও একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। অনেকের মুখে তাঁহার পুস্তকগুলির প্রশংসা

শুনিতে লাগিলাম। কাহারও কাহারও মুখে নিন্দাও শুনিলা।। আরও শুনিলাম, কেহ কেহ দুই চারিটি অক্ষর ভুল প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণান্ত করিতেছেন এবং বঙ্কিমবাবুর বিষম নিন্দা রটনা করিতেছেন। নিন্দা শুনিয়া মনে হইল, বুঝিবা বঙ্কিমবাবুর জন্য কাহারও কাহারও গাত্রদাহ আরব্ধ হইয়াছে। তখন 'দুর্গেশ-নন্দিনী', 'মৃণালিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা' কিনিয়া পড়িলাম। 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়িয়া মনে হইল, উহা স্কটের 'আইভান হো' পড়িয়া লিখিত। অনেকদিন পরে বঙ্কিমবাবুকে ঐ কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন,—'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিবার আগে 'আইভান হো' পড়ি নাই। আর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,— "তুমিই হিন্দু পেট্রিয়টে 'দুর্গেশনন্দিনী'র নিন্দা করিয়াছিলে?" আমি বলিয়াছিলাম, "না, হিন্দু পেট্রিয়টে যে সমালোচনা হইয়াছিল তাহা তোমারই কাছে প্রথম শুনিলাম।" তিনি বলিয়াছিলেন, —"সমালোচনা অন্যায্য হয় নাই এবং পড়িয়া মনে করিয়াছিলাম উহা তোমারই লেখা—প্রতিকূল হইলেও অমন সমালোচনা পড়িয়া সুখ হয়—সমালোচক জানিতেন না যে, তখন আমি 'আইভান হো' পড়ি নাই, তাই নিন্দা করিয়াছিলেন।"

তিনখানি উপন্যাস পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম যে, বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম। তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে'র গ্রাহক হইলাম। 'বঙ্গদর্শনে' 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশিত হয়। কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশিত হইলে পর, আমাদের দেশের



যৌবনে।





বার্দ্ধক্যে।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি 'বঙ্গদর্শনে'র প্রসঙ্গে অতিশয় ক্রোধ, বিরক্তি ও অবজ্ঞাব্যঞ্জক স্বরে আমার কাছে বলিয়াছিলেন—"ঐ আবার 'কুন্দনন্দিনী' একটা কি বাহির হইতেছে?" তেমন লোকের মুখে ওরূপ কথা শুনিয়া আমার মনঃকষ্ট হইয়াছিল - - সে মনঃকষ্ট এখনও যায় নাই, বোধ হয় কখনও যাইবে না। 'বঙ্গদর্শন' পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম, উহা পড়িবার পূর্ব্বে তাহা বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা ভাষায় সকল প্রকার কথাই সুন্দররূপে কহিতে পারা যায়; আর বুঝিয়াছিলাম যে ভাষা বা সাহিত্যের দারিদ্র্যের অর্থ মানুষের অভাব। 'বঙ্গদর্শন' বলিয়া দিয়াছিল বঙ্গে মানুষ আসিয়াছে—বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিভা প্রবেশ করিয়াছে।

তখনও কিন্তু আমি বঙ্কিমবাবুকে দেখি নাই। না দেখিলে সকলে যাহা করিয়া থাকে, আমিও তাহা করিতাম। মনে মনে তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিতাম। তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন এমন কেহ কেহ আমায় বলিতেন, 'বঙ্কিমের চেহারায় বুদ্ধি যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে।' আমিও প্রাণপণে মূর্ত্তি কল্পনা করিতাম। কিন্তু তাঁহাকে যখন দেখিলাম, তখন আমার কল্পিত মূর্ত্তি লজ্জায় কোথায় লুকাইয়া পড়িল তাহার ঠিকানা রহিল না। ২২ কি ২৩ বৎসর হইল 'কলেজ রি-ইউনিয়ন' নামে ইংরাজীওয়ালাদের একটা বাৎসরিক উৎসব হইত। সকল কলেজের পুরাতন ও নব্য ছাত্রেরা বৎসরে একদিন কলিকাতার নিকটস্থ একটা বাগান-বাটীতে সমবেত হইয়া পড়াশুনা, কথোপকথন, আলাপ পরিচয়, জলযোগ প্রভৃতি করিতেন। শুনিতাম, এরূপ করিলে দশজনের

মধ্যে সদ্ভাব জন্মিয়া একতা স্থাপনের সুবিধা হয়। এখনও শুনি যে, এইরূপ সম্মিলনাদি হইতে এইরূপ সুফল লাভ করা যায়। আমি তখনও একথা বিশ্বাস করিতাম না, এখনও করি না। মানুষের মত মানুষ হইলে তাহাদের সম্মিলনে সুফল ফলিতে পারে, নহিলে পারে না। আমরা ত মানুষ নহি। তথাপি ঐ 'কলেজ রি-ইউনিয়নে' যাইতাম। যাইতাম ওরূপ কিছু মনে করিয়া নয়; যাইতাম—কৃষ্ণবন্দ্যো, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচরণ, প্যারীচাঁদ, রামশঙ্কর, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় আমিও একজন কলেজোত্তীর্ণ—আমিও তাঁহাদের সমান এই শ্লাঘার ভরে। এবং আমার বিশ্বাস যে, অনেকেই আমার ন্যায় শ্লাঘার ভরে যাইতেন—সদ্ভাব সৃষ্টি বা বন্ধুত্ব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষী হইয়া কেহ যাইতেন না।

কিন্তু ও সকল কথা এখন থাক। আমি দ্বিতীয় 'কলেজ রি-ইউনিয়নে'র সহকারী সম্পাদক হইয়াছিলাম। সম্পাদক হইয়াছিলেন রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। সম্পাদক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 'মরকতকুঞ্জ' নামক প্রসিদ্ধ উদ্যানে সেবারকার উৎসব হয়। অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা করিতেছি এমন সময়ে একটা বিদ্যুৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিল। অপরকেও যে ভাবে অভ্যর্থনা করিতেছিলাম বিদ্যুৎকেও সেইভাবে অভ্যর্থনা করিলাম বটে, কিন্তু তখনই একটু অস্থির হইয়া পড়িলাম। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে? শুনিলাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি দৌড়িয়া গিয়া বলিলাম—'আমি

জানিতাম না, আপনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আর একবার করমর্দ্দন করিতে পাইব কি ?' সুন্দর হাসি হাসিতে হাসিতে বঙ্কিমবাবু হাত বাড়াইয়া দিলেন। দেখিলাম হাত উষ্ণ। সে উষ্ণতা এখনও আমার হাতে লাগিয়া আছে। সে হাত পুড়িয়া যায় নাই—আমার হাতের ভিতরেই আছে। যে ভালবাসাইয়া যায়, আগুনে তাহাকে পুড়াইতে পারে না।

সে দিন বঙ্কিমবাবুর সহিত আমার অধিক কথাবার্ত্তা হয় নাই। কিন্তু সন্ধ্যার পর রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের মূর্ত্তিমান্ রাগাদি (tableux vivantes) দেখিবার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'আপনি আপনার কোন্ উপন্যাসখানিকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করেন ?' ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়া, কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—'বিষবৃক্ষ'। তখন বোধ হয় 'চন্দ্রশেখর' পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরেই এক বিচিত্র ব্যাপারে আমাকে বঙ্কিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল। কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের প্রসিদ্ধ উকিল ৺কৃষ্ণকিশোর ঘোষ মহাশয়ের উইলসূত্রে হাইকোর্টে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। উইল বাঙ্গালায় লিখিত এবং উহার একটি বিধানের অর্থ লইয়া বিবাদ। এক পক্ষের ইচ্ছা, বঙ্কিমবাবুর দ্বারা উহার অর্থ করান। বঙ্কিমবাবুকে সম্মত করাইতে আমাকে অনুরোধ করা হয়। বঙ্কিমবাবুর পিতৃবন্ধু ঢায়মণ্ড হারবারের নিকটবর্ত্তী

সরিষা গ্রামনিবাসী ৺রামকুমার বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার সহোদর সদৃশ দুর্গারামকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলাম। তিনি তখন হুগলীর অন্যতম ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ; কাছারী করিতেছিলেন। শামলা মাথায় দিয়া গিয়াছিলাম, কারণ আমি তখন প্রতিদিন বড় আদালতে হাওয়া খাইতে যাইতাম। আমাকে দেখিয়া তিনি চিনিতে পারিলেন না—উকিল মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনারা কোন্ মোকদ্দমায় আসিয়াছেন ?' আমি বলিলাম—'আমরা কোন মোকদ্দমায় আসি নাই, আমার নাম—'। 'চন্দ্রবাবু !' —এই বলিয়া উঠিয়াই দাঁড়াইয়া মহা সমাদরপূর্ব্বক আমাদিগকে আপন পার্শ্বে বসাইলেন এবং আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিবেন বলিলেন। কিন্তু নিজে এমন কষ্টকর অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকার করিয়া আমাদিগকে একটি অতি সুখকর অনুরোধ পালন করিতে স্বীকার করাইলেন—রবিবার তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া আহার করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে বঙ্কিমচন্দ্রের পার্শ্বে বসিয়া সেই আমার প্রথম আহার। আহার করিলাম—আদর।

সকলেই এখন জানেন, বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাড়ী জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে গমনাগমন কালে অনেকে সে বাড়ী লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কতক প্রাচীন ধরণের, কতক নব্য ধরণের অট্টালিকা। সদরবাড়ীতে বৃহৎ পূজার দালান ও প্রাঙ্গণ। দুর্গারাম ও আমি বেলা ৯ ঘণ্টার সময় পৌঁছিয়া দেখিলাম সেই বৃহৎ প্রাঙ্গণে

গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইতেছে এবং পূজার দালানের প্রশস্ত রোয়াকে সমস্ত সমবেত শ্রোতৃবর্গের মাথার উপরে আপন মস্তক প্রায় অর্দ্ধহস্ত উত্তোলিত করিয়া এক দীর্ঘকায় বিশালবপু বলিষ্ঠ বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। দুর্গারাম বলিলেন, 'উনিই বঙ্কিমবাবুর পিতা, রায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর।' আমার মন সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বঙ্কিমবাবু এবং তাঁহার সহোদরদিগকে বড় পিতৃভক্ত দেখিয়াছি—সকলেই যেন এইভাবে বিভোর—"আমাদের পিতা অসাধারণ শক্তি ও মহত্ত্ব স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছেন!"

প্রাঙ্গণ বা পূজার দালানে বঙ্কিমবাবুকে দেখিতে না পাইয়া একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কোথায়? ভৃত্য বাহিরের একটি ক্ষুদ্র গৃহ দেখাইয়া দিল। গৃহটি একটি একতালা, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের শিবের মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে। উহা বঙ্কিমবাবুর নিজের বৈঠকখানা, সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যেমন আপনি ছিলেন তেমনই। অধ্যয়নের সুবিধার জন্য এবং অপূর্ব্ব লেখা লিখিবার ও বন্ধুদিগের সহিত অকৃত্রিম অপরিমেয় আলাপ করিবার উপযোগী নিভৃততার জন্য ঐ গৃহটি বঙ্কিমবাবুর বড়ই প্রিয় ছিল। উহা এখন সাহিত্যসেবীদিগের পীঠস্থান হইয়াছে। পীঠস্থানের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ জানি না। অনেক দিন তথায় যাই নাই। বড় আশা আছে, উহা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয়তম দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দরের পরম স্থান হইবে।

ঐ ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র পুস্তক পাঠ

করিতেছেন। আমাদিগকে পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আপনারা যে সত্য সত্যই আসিয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, আসিবেন না। রবিবার উকিলদের বাড়ীতে মক্কেলের ভিড় লাগে। মক্কেল পাইলে আপনাদের ত আর কিছুই মনে থাকে না।" কাঁটাল-পাড়ার বাড়ীতে অনেকবার গিয়াছিলাম, একবারের কথা বলি। নবমী পূজার দিন প্রাতে গেলাম। সঞ্জীববাবু, বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি পূজার দালানে বসিয়া আছেন। দেবীকে প্রণাম করিয়া বসিতে যাইতেছি, বঙ্কিমবাবু বলিলেন,—'তা হবে না, রাধানাথকে প্রণাম করিয়া আসিয়া ব'স।' দেবীর প্রতিমার দক্ষিণ পার্শ্বে সুন্দর বিগ্রহ দেখিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিগ্রহের কথা কহিতে বড় ভালবাসিতেন, বলিতেন,—'উনি আমাদের বংশের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করেন, সমস্ত দুর্গতি নাশ করেন। আমাদের সকল কথা শুনেন, সব আব্দার রক্ষা করেন, রোগে শোকে বিপদে আমরা উঁহারই মুখ চাহিয়া থাকি, উঁহাকেই ধরি, উনি আমাদিগকে বড় ভালবাসেন।' এমন সরলভাবে এমন ভক্তিভরে রাধানাথের কথা কহিতেন যে শুনিতে শুনিতে আমার চক্ষে জল আসিত। একবার বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর একখানি অলঙ্কার চাহিয়া পাঠাই। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছিলেন —"অলঙ্কারখানি এখন পাইবে না। আমার আরোগ্য কামনা করিয়া আমার স্ত্রী উহা রাধানাথের নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন, এখনও উদ্ধার হয় নাই।"

বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমবাবু যে সময় কাঁটালপাড়ায় থাকিয়া হুগলীতে কর্ম্ম করিতেন, সেই সময়ের মধ্যে আমি ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া ঢাকায় যাই। তিনি কিন্তু আমায় বলিয়াছিলেন—'যাইতেছ যাও, কিন্তু ও কাজে থাকিতে পারিবে না।' আমি ছয়মাস মাত্র ডিপুটিগিরি করিয়া উহাতে ইস্তফা দিয়া আসি। তাহার দিনকতক পরে বঙ্কিমবাবু হুগলীতে বাসা করেন। দুইটি বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। যোড়াঘাটের ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বের বাড়ীতে তাঁহার বৈঠকখানা এবং বৈঠকখানার দক্ষিণে দুইখানা বাড়ীর পর একটি বাড়ী তাঁহার অন্দর ছিল। অন্দর-বাটীর পূর্ব্বাংশের চাতালটি স্তম্ভোপরি নির্ম্মিত। উহার নীচে দিয়া গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত হইত। ঐ চাতালে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমবাবু একদিন বলিয়াছিলেন—'সন্ধ্যার পর আমরা এইখানে বসিয়া থাকি।' বুঝিয়াছিলাম, নিশীথে আপনারগুলিকে লইয়া ভাগীরথী ভোগ করেন। তিনি স্রোতস্বিনীর শোভা দেখিতে বড় ভালবাসিতেন। বৈঠকখানা-বাড়ীতে তিনটি ঘর ছিল; তন্মধ্যে মাঝের ঘরটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। সেই ঘরে গঙ্গার দিকে একটি বাতায়নের পার্শ্বে একখানি ইজিচেয়ারে বসিতেন। কথা কহিতেন আর গঙ্গা দেখিতেন। গঙ্গা দেখিয়া তাঁহার ক্লান্তি বা বিরক্তি হইত না। আমি প্রায় প্রতি শনিবারে সেখানে যাইতাম। কোন শনিবার না গেলে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। আমি প্রায়ই নৈহাটী দিয়া যাইতাম। নৌকায় আমায় দেখিতে পাইবামাত্র ঘাটের নিকটে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেন।

একবার ঘাটে নৌকা পৌঁছিবামাত্র আমি নামিলাম না দেখিয়া বলিলেন,—'এস।' আমি বলিলাম—'যাব কি না তাই ভাবছি।' যাইবামাত্র হাসি আর আলিঙ্গন। সে কথা আর কি বলিব।

বঙ্কিমবাবুর খাওয়াইবার বন্দোবস্ত বড় চমৎকার ছিল। আদরের খাওয়া ভিন্ন তাঁহার কাছে কখনই খাই নাই। যখনই গিয়াছি, দুই এক দণ্ড পরেই নানা সামগ্রী প্রস্তুত দেখিয়াছি। যখনই আসিতে চাহিয়াছি, তখনই নানা সামগ্রী খাইয়া আসিয়াছি। ভাবিতাম, এসব কি মন্ত্রে প্রস্তুত হয়! শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়াছিলাম মন্ত্রেই প্রস্তুত হয়—আর তাঁহার পত্নীই সেই মন্ত্র। আমি ত অনেকবার গিয়া অনেক দেখিয়াছিলাম। আমার ঋষিতুল্য বন্ধু রামায়ণের বিখ্যাত অনুবাদক হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন একবার মাত্র আমার সঙ্গে গিয়া বলিয়াছিলেন ঃ— 'বঙ্কিমবাবু কি বন্ধুবৎসল!' একবার সন্ধ্যার কিছু পরেই পৌঁছিয়া শুনিলাম, তাঁহার জ্বর হইয়াছে—তিনি অন্দরে শুইয়া আছেন। কিন্তু সংবাদ পাইবামাত্র উঠিয়া আসিলেন, আসিয়া নানা কথা কহিলেন। আমি যতক্ষণ আহার করিলাম, ততক্ষণ আমার কাছে উপবিষ্ট রহিলেন—যেন কোন অসুখই হয় নাই, যেন দেহে ও মনে স্ফূর্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

বঙ্কিমবাবু সাহিত্যানুরাগীদিগের সহিত আলাপ করিতে ভালবাসিতেন—আলাপ করিলে ভাল থাকিতেন। সাহিত্য ও সাহিত্যানুরাগীর সংসর্গ তাঁহার যেন প্রাণবায়ু ছিল। সে

সংসর্গ না পাইলে তাঁহার প্রাণ যেন ফুলিয়া উঠিত। যেবার হেমচন্দ্রকে লইয়া যাই, সেবার গিয়া দেখি মহামহোপাধ্যায় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আসিয়াছেন। শীতকাল সন্ধ্যা আগত-প্রায়। শীঘ্রই টেবিলের উপর দীপ জ্বলিতে লাগিল। সকলে টেবিল বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। অতুল রূপ, সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব, অপূর্ব্ব কমনীয়তামিশ্রিত অসীম প্রতিভা ও পুরুষ-কারব্যঞ্জক মুখগৌরব লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যেন সম্রাটের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অন্তরে কি আনন্দ! হেমচন্দ্র উপস্থিত—অগ্রে রামায়ণ ও মহাভারতের কথা আরম্ভ হইল; সেই কথা হইতে আরও কত কথা আসিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কি স্ফূর্ত্তি! স্ফূর্ত্তিতে এই কথা ফুটিতে লাগিল—ইহাই ত সুখ, ইহাই ত জীবন—এই রকমই ত চাই।

সাহিত্যের সংস্রব মাত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র সুখী হইতেন। এক শনিবার আফিস হইতে বেলা তিনটা কি চারিটার সময় তাঁহার কলিকাতার বাসায় গিয়া দেখি, অসুস্থতার জন্য তিনি মেজের উপর শয্যায় শুইয়া আছেন, আর দুই খানা কেদারায় দুইটি যুবক বসিয়া আছেন। একটি যুবককে আমি চিনিতাম। তিনি একখানা ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক লিখিয়া বঙ্কিমবাবুকে উপহার দিতে গিয়াছিলেন। আমি যাইবার দুই চারি মিনিট পরেই যুবক দুইটি চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'ইঁহারা কতক্ষণ ছিলেন?' তিনি বলিলেন—'দুই তিন

ঘণ্টা হইবে।’ সাহিত্যের সংস্রব ছিল বলিয়াই বঙ্কিমবাবু অত ছোট যুবক দুইটিকে লইয়া অতক্ষণ স্থির ধীর প্রফুল্ল ভাবে থাকিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলাম, যুবকদ্বয় তাঁহার নিকট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন।

মাতৃভাষায় লিখিতে, বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে তিনি অনেককেই উৎসাহিত করিতেন। আমি কখন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য ঘৃণা করি নাই। তখন চারিদিকে মাতৃভাষার নিন্দা শুনিতাম, স্কুলেও উহা ভাল করিয়া শেখান হইত না। কিন্তু আমি লুকাইয়া বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লিখিতাম। লিখিয়া লুকাইয়া রাখিতাম—কাহাকেও দেখাইতাম না। বঙ্কিবাবু যখন যোড়াঘাটের বাড়ীতে ছিলেন, তখন বাঙ্গালা লিখিবার জন্য আমায় বড়ই পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম— ‘ভয় করে, বানান ভুল করিয়া হাস্যাস্পদ হইব ?’ তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—‘বঙ্গদর্শন প্রেসে একজন পণ্ডিত আছেন, তিনি বানান ঠিক করিয়া দেন।’ বঙ্কিমবাবুর যোড়াঘাটের বাড়ীতে আমি হরপ্রসাদকে প্রথম বন্ধুস্বরূপ পাই। হরপ্রসাদের বাড়ী নৈহাটীতে। তিনি সর্ব্বদাই গঙ্গা পার হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বাসায় যাইতেন। তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্রের পরম ভক্ত দেখিতাম, বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন, তাঁহার বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রশংসা করিতেন এবং তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় উৎসাহিত ও নিয়োজিত করিতেন।

আলিপুরে বদলী হইলে বঙ্কিমবাবু কলিকাতায় বাসা

করিয়াছিলেন। তখন প্রত্যেক ছুটীর দিন বৈকালে ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং আমি তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম। নানা শাস্ত্রজ্ঞ, গম্ভীরপ্রকৃতি, বালকবৎ সরলতা-শোভিত রাজকৃষ্ণকে বঙ্কিমবাবু যেমন ভালবাসিতেন তেমনি ভক্তি করিতেন। রাজকৃষ্ণের মৃত্যুর দিন বঙ্কিমচন্দ্র বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতার বাসায় তাঁহার আরও কয়েকটি বন্ধু বড় অনুরাগভরে আসিতেন—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কলিকাতায় থাকিলে তিনি; তারাকুমার কবিরত্ন, বঙ্কিমের সহাধ্যায়ী বলাইচাঁদ দত্ত, কবি হেমচন্দ্র, কোমৎমতাবলম্বী যোগেন্দ্রচন্দ্র। আর সর্ব্বদাই সেখানে থাকিতেন—বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যম দাদা সঞ্জীবচন্দ্র। বঙ্কিমবাবুর প্রতিভা ও হৃদয়ের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আমরা তাঁহার কাছে যাইতাম।





চতুর্থ অধ্যায়

যুক্তিপ্রধান রচনা



সাহিত্যের লক্ষ্য।



পৃথিবীতে যদি একটি মাত্র মনুষ্য থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় সে বাক্‌শক্তিহীন হইত। বাক্‌শক্তি থাকিলেও, বোধ হয় তাহাকে তাহা ব্যবহার করিতে হইত না। মনুষ্যের সংখ্যা একাধিক বলিয়াই তাহাদিগকে কথা কহিতে হয়। অন্যকে আপন অভিপ্রায়াদি জ্ঞাপন করিবার জন্যই লোকে কথা কয়। লোকে লেখেও সাধারণতঃ সেই জন্য। যাহার অন্যকে কিছু বলিবার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় নাই সে লিখিবে কেন? সে মনের কথা মনেই রাখিয়া দিবে। মনের কথা

বিস্মৃত হইবার ভয়ে যদিও লেখে, তাহা হইলে যাহা লিখিবে তাহা আপনার কাছেই রাখিয়া দিবে, অন্যকে পড়িতে দিবে না। সে যদি পুস্তকাদি লিখিয়া বিক্রয় বা বিতরণ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার অভিপ্রায়, অন্যে তাহার পুস্তকাদি পাঠ করে। দার্শনিক বল, কবি বল, ইতিহাসবেত্তা বল, বৈজ্ঞানিক বল, সকলেরই সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারা যায়। কিন্তু অপরে যাহা পড়িবে, তাহাতে এমন কিছুই থাকা উচিত নয়, যদ্দ্বারা অপরের অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ অপরের অনিষ্ট করিবার অধিকার কাহারই নাই—দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, কবি, নাটককার, উপন্যাসকার, কাহারই নাই। অপরকে যদি কিছু পড়িতে দিতে হয়, তবে তাহা এরূপ প্রকৃতির হওয়া উচিত ও আবশ্যক যে, তাহা পড়িয়া অপরের অপকার না হইয়া উপকারই হয়। এতএব অপরে যাহা পড়িবে, অপরের হিতাহিতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহা লেখা কর্ত্তব্য। কেবল আপন মনের আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা আপন তৃপ্তি সাধনের জন্য লেখা অন্যায় ও অবিধেয়। স্বভাব চরিত্রের বিভিন্নতাবশতঃ মনের আবেগ ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে। সুতরাং লোকের কেবল মনের আবেগে লিখিবার বা আপন তৃপ্তি সাধনের জন্য লিখিবার অধিকার আছে, ইহা স্বীকার করিলে, অতি জঘন্য এবং সমাজের বিষম অনিষ্টকর লেখা সম্বন্ধেও কোন আপত্তি করিতে পারা যায় না। কিন্তু

আপত্তি যে হইতে পারে বা হওয়া কর্ত্তব্য, রাজবিধানে অশ্লীল লেখার দণ্ডের ব্যবস্থাতেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। যে সাহিত্যে বা সাহিত্যের যে সকল অংশে সমাজের অনিষ্ট সাধিত হয়, অথবা লোকমধ্যে কুরুচি, কুপ্রবৃত্তি, কুৎসাপ্রিয়তা, ঔদ্ধত্য, অসারতা, আড়ম্বরপ্রিয়তা, কপটতা প্রভৃতি অসদ্‌গুণের সৃষ্টি করে বা বৃদ্ধি সাধন করে, তাহা সাহিত্য নামের অযোগ্য, সাহিত্য নামে তাহা অভিহিতই হইতে পারে না।

আবার যদ্দ্বারা লোকের উপকার সাধন করিতে হয় তদ্দ্বারা যত অধিক পরিমাণে এবং যত অধিক লোকের উপকার সাধিত হয় ততই ভাল, তাহার সার্থকতা ততই বেশী। সাহিত্য হইতে উপকারের পরিমাণ যত বেশী হয় এবং যত অধিক লোকের উপকার হয়, উহার সার্থকতাও তত বৃদ্ধি হয়, উহা সাহিত্য নামেরও তত যোগ্য হয়। লোকমধ্যে সাহিত্য যত সুশিক্ষা প্রচার করিবে এবং সদিচ্ছা, সৎপ্রবৃত্তি ও সদ্‌ভাবের উদ্রেক করিবে, উহার উদ্দেশ্য তত সিদ্ধ হইবে, উহার প্রকৃতি তত উন্নত হইবে। সুশিক্ষিত, সুনীতিপরায়ণ, সচ্চরিত্র সদাশয়, উদারহৃদয় সেবক পাইলেই সাহিত্যের এইরূপ সিদ্ধি ও উন্নতি হয়। আর সাহিত্যের দ্বারা অধিক লোকের অর্থাৎ সমাজের উচ্চ নীচ শ্রেণীনির্ব্বিশেষে লোকসাধারণের উপকার সাধন করিতে হইলে, সাহিত্যসেবীদিগকে এমন করিয়া সাহিত্য রচনা করিতে হয়, সাহিত্যে এমন ভাষার ব্যবহার করিতে হয় যে, উহা লোকসাধারণের যতদূর সম্ভব বোধগম্য ও আয়ত্ত হয়।

যাহা সকলের পাঠ্য হইবার উপযুক্ত, সকলে বুঝিতে পারে এরূপ সরল, সহজ, স্থানীয় বিশেষত্ববর্জ্জিত ভাষায় তাহা লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য। নহিলে তদ্দ্বারা লোকের উপকার সাধিত হয় না। দর্শন বা বিজ্ঞানের উচ্চতম অংশ বা তদ্রূপ বিষয় সকল লোকসাধারণের পাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না বটে এবং সেইজন্য সচরাচর এমন কঠিন ভাষায় ও দুরূহ প্রণালীতে লিখিত হয় যে, ঐ সকলের অধ্যয়ন প্রায়ই এক এক ক্ষুদ্র শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু চেষ্টা করিলে ঐ সকল বিষয়ও এমন ভাষায় লিখিতে পারা যায় যে, এখনকার অপেক্ষা অধিক লোকে উহাদের আলোচনায় নিযুক্ত হইতে পারে। দর্শন বিজ্ঞানাদি বিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থাদির ভাষা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে সাধারণের উপযোগী ও বোধগম্য করা হইতেছে। অবশ্য পরিভাষার কথা স্বতন্ত্র।

কোন জাতির মধ্যে সাহিত্য লোকসাধারণের যত উপযোগী হয় উহা ততই জাতায় ভাবাক্রান্ত হইতে থাকে এবং যাহাদিগকে লইয়া সেই জাতি তাহাদেরও মনে এক জাতীয়তার ভাব তত উদ্রিক্ত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। সমগ্র জাতির মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাহিত্য রচনা করিলে সাহিত্যের সাহায্যে বড় বৃহৎ, বড় মহৎ, বড় সুন্দর, বড় পবিত্র কার্য্য করিতে পারা যায়। সাহিত্য বড় সামান্য সামগ্রী নহে, বড় সহজ সামগ্রীও নয়। সুপ্রণালীতে রচিত হইলে, উহা জাতি গড়িবার কার্য্যে যেমন সহায়তা করে, কুপ্রণালীতে রচিত হইলে, জাতি ভাঙ্গিবার পক্ষে

তেমনি কার্য্যকর হয়, জাতি গঠনের তেমনি প্রতিবন্ধকতা করে। গঠনের গুণে সাহিত্য যেমন সুন্দর, যেমন অমৃতময় ফল প্রসব করে, গঠনের দোষে তেমনই কদর্য্য, তেমনই বিষময় ফল প্রদান করে। যে সাহিত্যের ফল কদর্য্য ও বিষময়, যে সাহিত্য জাতি ভাঙ্গে বা গড়িতে দেয় না, তাহা জাতীয় সাহিত্যেও নহে, প্রকৃত সাহিত্যও নহে।

ধৈর্য্য ও ক্ষিপ্রকারিতা

কার্য্যসিদ্ধির জন্য ক্ষিপ্রকারিতা, ব্যস্ততা প্রভৃতি গুণ আবশ্যক, না ধীরতা গাম্ভীর্য্যাদি গুণ আবশ্যক ? এ কথার সম্যক্ উত্তর এই যে উভয়ই আবশ্যক ; কিন্তু ধৈর্য্য, সংযম প্রভৃতি গুণই অধিক আবশ্যক। কোন কার্য্য করিতে হইলে অনেক দিক্, অনেক বাধাবিঘ্ন, অনেক সুবিধা অসুবিধা, অনেক অগ্রপশ্চাৎ, অনেক ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, অনেক ওজর আপত্তি উত্তমরূপে ধীরভাবে সাবধানে সুগভীর প্রণালীতে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। এই প্রকারে সকল রকম বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হয়, কার্য্য করা উচিত কি না। শুদ্ধ একটা ক্ষণিক মানসিক আবেগে কার্য্য আরম্ভ করা অকর্ত্তব্য। সকলদিক্ বিবেচনা না

করিয়া, কেবল ভাব বা আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া, অথবা একটা মতের খাতিরে কার্য্য করিলে ফল প্রায়ই শোচনীয় হয়। আবার কার্য্যের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যে অনেক বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। কার্য্য করিতে করিতে সে সকল বাধা বিঘ্নও ধীরভাবে বুঝিয়া দেখিতে হয়। নাহিলে আরব্ধ কার্য্য নিষ্ফল হয় অর্থাৎ কার্য্যসিদ্ধির জন্য বিচার বিবেচনা ও মন্ত্রণা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আবশ্যক। সে বিচার বিবেচনা বা মন্ত্রণায় ত্রুটি হইলে অপরিমিত উৎসাহ, উদ্যম, ক্ষিপ্রকারিতা ইত্যাদি সত্ত্বেও কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয় না। একটি উদাহরণ দিই। যুদ্ধক্ষেত্রে উদ্যম, উগ্রতা, চঞ্চলতা প্রভৃতি গুণ কার্য্যসিদ্ধির জন্য যত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, স্থৈর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি তত হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রণস্থলেও প্রথমোক্ত গুণগুলি অপেক্ষা শেষোক্ত গুণগুলি জয়লাভের জন্য বেশী আবশ্যক। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ওয়েলিংটনের উদ্যম, উগ্রতা ও উৎসাহ নেপোলিয়নের অপেক্ষা কম ছিল। নেপোলিয়নের ধৈর্য্য ও চিত্তস্থৈর্য্য ওয়েলিংটনের অপেক্ষা কম ছিল। অসংখ্য ইংরাজ-সেনার বিনাশ দেখিয়াও ওয়েলিংটন ব্লুকরের আগমন পর্য্যন্ত স্থির, ধীর, অবিচলিত ভাবে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন দূরে তোপধ্বনি হইতেছে শুনিয়া চিত্তস্থৈর্য্য হারাইয়া আপন পক্ষের সেনানায়ক মার্শাল গ্রুজে আসিতেছেন ভাবিয়া বীরবিক্রমে আপন সেনা রণস্থলে পরিচালন করিয়া শীঘ্রই পরাজিত হইয়াছিলেন।

ফলতঃ কার্য্যের উদ্যম, উৎসাহ ও ব্যস্ততার ভিতরেও অবিচলিত বুদ্ধি, স্থির চিত্ত, সম্পূর্ণ আত্মসংযম এবং গভীর চিন্তাশীলতা আবশ্যক। নহিলে কার্য্যে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। অধুনা এই সত্যটি আমাদের স্মরণ করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সকল সময়েই মানুষের এই সত্যটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন, কেন না মানুষ প্রায়ই মানসিক আবেগের বা ভ্রান্তসংস্কারের স্বল্পাধিক বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু আজকাল আমরা কিছু বেশী আবেগবান্ ও হঠকারী হইয়া, সকল দিক্ না দেখিয়া না বুঝিয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। কলেজ ছাড়িয়াই আমরা পালে পালে আদালতে ওকালতী করিতে যাই। ওকালতী করিতে যে অর্থ বা সহায়তা আবশ্যক তাহা আয়ত্ত কিনা, এবংবিধ নানা বিষয়ের মধ্যে কোনও বিষয়ই বিবেচনা না করিয়া আমরা দলে দলে উকিল হইতে যাই। ঠিক এই প্রকারেই আমরা দলে দলে ডাক্তার হইতে যাই। ঠিক এই প্রকারেই আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে চাকুরির উমেদার হই। ঠিক এই প্রকারেই আমরা পালে পালে মুদ্রাযন্ত্রের আশ্রয় লইয়া গ্রন্থকার হইয়া উঠি। আবার কোনও দিক্ না দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কিছুই না বুঝিয়া এক একটা ভাবের বা অপরিপক্ক সংস্কারের তাড়নায় আমরা উন্মত্তের ন্যায় গৃহসংস্কার, সমাজসংস্কার, ধর্ম্মসংস্কার প্রভৃতি আকাশ পাতাল সংস্কার করিতে যাই। কোন সংস্কারই করিতে পারি না। বরং একটা দোষের সংস্কার করিতে গিয়া দশটা দোষের সৃষ্টি করিয়া বসি। রোগীর

রোগের চিকিৎসা করিতে গিয়া আমরা আধমিনিটের মধ্যে রোগের পরীক্ষা শেষ করিয়া এমনি ঔষধাদির ব্যবস্থা করি যে, আধঘণ্টার মধ্যে স্বয়ং রোগীরও শেষ হইয়া যায়। এইরূপ সকল কার্য্যেই আমরা ভাবি যে, তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি লম্ফঝম্প করিলেই খুব ভাল কাজ করা হয়। তাই যেমন আমাদের মনে একটা খেয়াল উঠে অমনি আমরা তদনুসারে কার্য্য করিতে অগ্রসর হই। সেই জন্য আমরা কোন কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারি না।

ভোগাসক্তি।

—•:*:•—

যাহারা পার্থিব বাসনায় বিহ্বল, বাধাবিঘ্ন ব্যতিরেকে পূর্ণমাত্রায় বাসনার পরিতৃপ্তি করা যাহারা জীবনের একটা বড় উদ্দেশ্য মনে করিয়া উদ্দামভাবে আপনাদিগকে ভোগের পথে প্রধাবিত করে, তাহারা যেমন অন্ধ তেমনি স্বাধীনতাহীন। অন্ধের পথ যেমন বিপদ্‌সঙ্কুল, তাহাদের পথও তেমনি। অন্ধও যেমন পথে কোথাও পড়িয়া গিয়া হাত পা ভাঙ্গিয়া ফেলে, কোথাও ধাক্কা পাইয়া মাথা ফাটায়, কোথাও কাহারও ঘাড়ে পড়িয়া তাহার গুরুতর আঘাত ঘটায়, তাহারাও তেমনি আপনারাও কত বিপদে পড়ে, পরকেও কত বিপদে ফেলে। উদাহরণ দ্বারা এ কথার

যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিবার আবশ্যকতা নাই। বাসনাবিহ্বল হইলে লোকে যে বাসনা তৃপ্তির উপায়াদি সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠে ইহা কেহ কখন অস্বীকার করিতে পারে নাই এবং পারিবে না। বাসনায় যাহারা জ্ঞানশূন্য তাহারা করিতে না পারে এমন কাজ নাই, ঘটাইতে না পারে এমন ঘটনা নাই। তাহারা প্রকৃত স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহা জানে না। যে ব্যক্তি পৃথিবীর মোহে মুগ্ধ, পার্থিব বাসনায় বিহ্বল, তাহার আপনার উপর আপনার আধিপত্য নাই, সে নিজে নিজের রাজা নয়। সে নিতান্ত পরাধীন—পৃথিবীতে তাহার মত ক্রীতদাস আর নাই। লোভ, মোহ, বাসনা তাহাকে যাহা করায়, আপত্তির নামটি পর্য্যন্ত না করিয়া সে তাহাই করে। সে জ্ঞানপরিচালিত নহে, বাসনাবিতাড়িত। বাসনাবিতাড়িতেরা দেখিতে দুই দিন সজীব সতেজ সমারোহসম্পন্ন হইলেও প্রকৃত পক্ষে ধ্বংসাভিমুখী। বাসনাধিক্যে বিপদ্ ও বিনাশের বীজ নিহিত থাকিবেই থাকিবে।

অনেকে বলেন যে বহু পূর্ব্বকালে যে পথেই মানুষের শ্রেয়ঃ হইয়া থাকুক, মানবের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা আর উপযোগী নহে। কারণ মানুষের পার্থিব অভাব পূর্ব্বকালে অতি অল্পই ছিল, এখন অসংখ্য হইয়া পড়িয়াছে, এবং অভাবমোচন পূর্ব্বকালে যেমন সহজসাধ্য ছিল এখন তেমনি দুঃসাধ্য হইয়াছে। মানুষের অভাবের সংখ্যা বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু যত বাড়িয়াছে তত বাড়িবার কথা ত নয়। মানুষের নিজের নিজের অভাবের হেতু পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল এখনও প্রায় সেইরূপ আছে। পূর্ব্বেও

মানুষের যেমন একটা শরীরে একটা মাথা, একটা পেট, দুইটা হাত, দুইটা পা ছিল, এখনও ঠিক তাহাই আছে। পূর্ব্বে মানুষকে একটা পেটের খাদ্য, একটা দেহের বস্ত্র, দুইটা পায়ের জুতা সংগ্রহ করিতে হইত আর এখন দুইটা পেটের খাদ্য, দুইটা দেহের বস্ত্র, চারিটা পায়ের জুতা সংগ্রহ করিতে হয় এমন নহে। তথাপি অনেকে বলেন যে মানুষের অভাবের সংখ্যা বড়ই বাড়িয়াছে। কিন্তু যত বাড়িয়াছে সকলেই যে অনিবার্য্য কারণে বড়িয়াছে তাহা নহে। নিরাপদে নদী পার হইতে পারিবার জন্য সেতু একটি ন্যায্য অভাব। সমুদ্রপার হইতে যতদূর সম্ভব নিরাপদে উদরান্ন আনিতে পারিবার জন্য কলের জাহাজ একটি ন্যায্য অভাব। কিন্তু যত জিনিস এখন অভাব বলিয়া গণ্য হয় সকলই কি এমনি ন্যায্য অভাব? তুমি পূর্ব্বে কেবল পান খাইতে, এখন আবার চা, কাফি প্রভৃতি খাইতেছ। যখন কেবল পান খাইতে তখন কি তোমার শরীর ভাল থাকিত না, আর এখন পানের উপর চা, কাফি ইত্যাদি চড়াইয়া কি ব্যাধিমুক্ত হইয়াছ? ফল কথা, মানুষের নিজের নিজের প্রকৃত অভাব বেশী বাড়িবার কথাই নয়, বাড়িয়াছেও অতি অল্প। কিন্তু যাহা না হইলেও চলে, ভোগলালসাব াসনানুবর্ত্তিতা প্রভৃতির দোষে তাহা নিত্যব্যবহার্য্য হইয়া পড়ায় প্রকৃত অভাবস্বরূপ অনুভূতও হইতেছে, গণ্যও হইতেছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য, লোকালয়সংকল্পের• গঠনপ্রণালীর পরিবর্ত্তনের জন্য এবং অন্যান্য কারণে মানবজাতি বা সমাজের অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে

সন্দেহ নাই। এক লক্ষ লোকের জন্য যত খাদ্য উৎপাদন বা সংগ্রহের প্রয়োজন, এক কোটি লোকের জন্য তদপেক্ষা অনেক অধিক খাদ্য আবশ্যক। অত বেশী খাদ্য উৎপাদনার্থ ব্যয়ও অনেক বেশী করিতে হয়; সম্ভবতঃ উৎপাদনের প্রণালীও নূতন রকম করা আবশ্যক হইতে পারে। এই সকল কারণে প্রকৃত অভাব বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু এত বাড়ে নাই, এত বাড়িতে পারেও না যে মানুষকে ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল হইতে হয়, খাটিয়া খাটিয়া মৃতকল্প হইতে হয়, অথবা সেই চিন্তায় পরকালের চিন্তা উড়াইয়া দিতে হয়। যাহা প্রকৃত অভাব নয়, পৃথিবীর মোহে তাহাকে অভাব করিয়া তুলিয়া অনেকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে,—অভাব মোচন করিব, না পরকালের ভাবনা ভাবিব? অভাব মোচন কি জন্য পূর্ব্বকালের অপেক্ষা কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য হইয়াছে তাহা কতকটা বুঝা যাইতেছে। যাহা না হইলে মানুষের চলে এবং যাহাতে মানুষের উপকার না হইয়া বরং অপকার হয় এমন বহুতর সামগ্রী অভাবস্বরূপ হইয়া উঠায় সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচনই এক্ষণে এত অধিক শ্রমসাধ্য ও কষ্টকর হইয়াছে। আহার্য্য, পরিধেয়াদি না হইলে চলে না। লোকসংখ্যাদি বৃদ্ধি হইলে এই সকল সামগ্রী সংগ্রহ করাও কিছু কষ্টকর হইয়া থাকে বটে। কিন্তু যে সকল সামগ্রী না হইলে চলে সেই সকল সামগ্রীকে আহার্য্যাদির ন্যায় অপরিহার্য্য করিয়া তুলিলে আহার্য্যাদি সংগ্রহ করাও যে বড় বেশী পরিমাণে কষ্টকর হইয়া

পড়ে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলতঃ মানুষের যদি কৃত্রিম অভাব না থাকে এবং ইহকাল অপেক্ষা পরকালের প্রতি বেশী দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে আহার্য্যাদির জন্য তাহাকে বিব্রত ব্যতিব্যস্ত বা বিপন্ন হইতে হয় না।

কারণরহস্য

-০:*:০—

নিতান্ত অসভ্য বা আদিম অবস্থায় মানুষ একলা একলা থাকে। তাহার পর ক্রমে ক্রমে নানা কারণে দশজন মানুষ একত্র হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। তখন মানুষের সমাজ গঠিত হয়। জগতের অপর সকল সামগ্রীর ন্যায় মানব-সমাজও পরিবর্ত্তনশীল। কোন সমাজের কোন পরিবর্ত্তনই অকারণে হয় না, অতি স্বাভাবিক, অতি অনিবার্য্য কারণেই হয়। সমাজের দুইটি অবস্থার মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রথমটির ফলস্বরূপ, অতএব প্রথমটির সহিত সম্বন্ধশূন্য হইতে পারে না। এইরূপে সমাজের কোন একটি অবস্থা উহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত অবস্থার ফল বা পরিণাম—অতএব উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন অবস্থার সহিত সম্বন্ধ-শূন্য নহে। হিন্দু-সমাজের অবস্থার শত শত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং উহার বর্ত্তমান অবস্থা সেই শত শত

পরিবর্ত্তনের ফল। পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, উহার বর্ত্তমান অবস্থায় বহু কারণ বহু দূরকালে উপস্থিত হইয়াছিল। আবার সমাজের যত অবস্থান্তর ঘটিতে থাকে কতকগুলা কারণের সহিত অপর কতকগুলা কারণ ততই জড়িত বা মিশ্রিত হইয়া পড়ে। সেই জন্য হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার কারণের দূরত্ব ও জটিলতা এক রকম অসীম হইয়া পড়িয়াছে। কারণের এই দূরত্ব ও জটিলতাবশতঃ উহার অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না, অনেকগুলি বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের প্রচলিত ধর্ম্ম—দেব-দেবীর পূজা—ইহাও আমরা বুঝি কি না সন্দেহ। কেমন করিয়া বুঝিব? ইহার ভিত্তিস্থলে, ইহার কারণরূপে বেদ, উপনিষৎ, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র সকলই থাকা সম্ভব, আছে বলিয়া একটু একটু অনুভূতও হয়। কিন্তু ও সকলের সহিত আমরা এক রকম অপরিচিত, সুতরাং আমাদের প্রচলিত ধর্ম্মও আমাদের এক রকম অপরিচিত। যেখানেই কারণের দূরত্ব ও জটিলতা সেইখানেই এইরূপ অজ্ঞতা। আমরা আমাদিগকেই ঠিক জানি না, ঠিক বুঝি না।

আবার কোন সমাজের অবস্থাবিশেষের কারণ কেবল যে সেই সমাজেই উৎপন্ন হয় তাহা নহে, অন্য সমাজ হইতেও আইসে। প্রকৃত পক্ষে কোন একটি সমাজের কোন একটি অবস্থা যেমন উহার অন্য কোন অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ-শূন্য হইতে পারে না, তেমনি কোন একটি সমাজ অন্য সমস্ত সমাজের সহিত সর্ব্বপ্রকারে সম্বন্ধরহিত হইতে পারে না।

সম্বন্ধশূন্য হওয়া দূরে থাকুক, বহুসমাজের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ এত অধিক এবং এত জটিল যে, তাহা পরিষ্কার করিয়া নির্ণয় করা অসম্ভব। বৃহৎ স্রোতস্বতীতে যখন প্রবল তরঙ্গ উঠিয়া ভীমবেগে ছুটিতে থাকে তখন দেখা যায়, এক এক স্থানে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল দিক্ হইতেই তরঙ্গ আসিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, কোন্ তরঙ্গটা কোন্ দিকের, আর ঠিক করিতে পারা যাইতেছে না, সমস্ত তরঙ্গভাঙ্গা সমস্ত জল এমনি মিশ্রিত হইয়া পড়িতেছে যে, কোন্ জলটুকু কোন্ তরঙ্গ ভাঙ্গা তাহার আর কোন ঠিকানাই হইতে পারিতেছে না। বহু সমাজের সম্বন্ধের প্রকৃতিও প্রায় এইরূপ। সুতরাং মানবের ইতিহাসে মানবকে বুঝা বড়ই কঠিন। ফিনিসিয়া, আসিরিয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশবাসীদিগকে ঠিক জানা হইয়াছে, ঠিক বুঝা হইয়াছে কিনা সন্দেহ, এবং আধুনিক ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মান, ইতালীয় প্রভৃতিকেও ঠিক জানা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ফলতঃ মানুষ মানুষকে ভাল বুঝিতে পারে নাই, বোধ হয়, কখন পারিবেও না। বড় বড় ঐতিহাসিকদিগের একই বিষয়ের ব্যাখ্যা বা বর্ণনায় যেরূপ অনৈক্য দেখা যায় তাহাতেও এইরূপই মনে হয়।

কিন্তু ব্যক্তি বা বংশবিশেষের কারণরহস্য অথবা মানব-জাতির কারণরহস্য সমস্ত জগতের কারণরহস্যের সহিত তুলনায় রহস্যই নয়। ইংরাজ কবি টেনিস্‌ন বলিয়াছেন—'All that was to be in all that was'—এ কথার অর্থ, যাহা

কিছু হইবার তাহা, যাহা কিছু ছিল, তাহারই মধ্যে ছিল। যাহা কিছু হইবার, অর্থাৎ যখন কিছুই হয় নাই তখন হইবে বলিয়া যাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা, তখন যাহা ছিল, তাহাতেই ছিল। অথবা যাহা পরিদৃশ্যমান তাহা অপরিদৃশ্যমানেতেই ছিল। কিন্তু আদি বিকাশে আর এক্ষণকার বিকাশে প্রভেদই বা কত, সাদৃশ্যই বা কোথায়? অথচ আজিকার বিকাশ সেই আদি বিকাশ হইতেই উদ্ভূত, তাহারই পরিণতি। সে পরিণতি মানব-বুদ্ধির একান্ত অতীত ও অনায়ত্ত। কোটি কোটি অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনের ফলে আদি বিকাশ এক্ষণকার বিকাশে দাঁড়াইয়াছে। আবার কোটি কোটি পরিবর্ত্তনের ফলে এক্ষণ-কার বিকাশ ভবিষ্য বিকাশে দাঁড়াইবে। অর্থাৎ, আদি বিকাশ এক্ষণকার বিকাশের কারণ; এক্ষণকার বিকাশ ভবিষ্য বিকাশের কারণ। কিন্তু আদি বিকাশ ও বর্ত্তমান বিকাশের মধ্যে কোন সাদৃশ্যই নাই—এখন মৃত্তিকা আছে, প্রস্তর আছে, উদ্ভিদ্ আছে, জীব জন্তু আছে; আদিতে এসব ছিল না। যাহা ছিল তাহা হইতেই এসব হইয়াছে বটে। কিন্তু যাহা ছিল কেমন করিয়া তাহা হইতে এসব হইল কাহারও সাধ্য নাই বলিয়া দেয়, কেহ তাহা কখন জানে নাই, ভয় হয়, কেহ তাহা কখনও জানিবেও না।

আবার দেখ, একটি মানুষকে বুঝিতে হইলে তাহার পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরকুল, তাহার পিতামাতা, 'তাহার জন্ম, শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা, বার্দ্ধক্য, বিষয় কর্ম্ম,

আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি অসংখ্য বিষয় বুঝিতে হয়। মানুষটি আমাদের সমসাময়িক অথবা নিকটবর্ত্তী হইলেও, এ সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায় না, সুতরাং মানুষটিকেও সম্পূর্ণ বুঝা হয় না। অধিকন্তু মানুষটিকে জগতের অন্যান্য পদার্থের ন্যায় একটি পদার্থ বলিয়া ধরিলে, তাহাকে বুঝা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, জগতের অন্যান্য পদার্থের ন্যায় এক একটি মানুষও কোটি কোটি পরিবর্ত্তনরূপ কোটি কোটি কারণের ফল। অত কারণ ভেদ করে এমন মানুষ ত এ পর্য্যন্ত হইল না। বাঘের ও হরিণের মধ্যে প্রভেদ কি, প্রাণিতত্ত্ববিদ্ তাহা বেশ বলিয়া দিতে পারেন। হরিণের শৃঙ্গ আছে, বাঘের শৃঙ্গ নাই, ইত্যাদি। কিন্তু আদি বস্তুর ক্রমবিকাশের ফলে বাঘই বা কেমন করিয়া হইল এবং হরিণই বা কেমন করিয়া হইল, কোন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ তাহা কখনও বুঝেন নাই, কখন বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আশাও হয় না। উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিদ্ বৃক্ষলতাদি সম্বন্ধে অনেক কথা কহিয়া থাকেন। কিন্তু আদি বস্তুর ক্রমবিকাশের ফলে তাল তিন্তিড়ী বৃক্ষই বা কেমন করিয়া হইল এবং লতা-গুল্মই বা কেমন করিয়া হইল, তিনি তাহা কখন বুঝিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি, কখন বুঝিবেন বলিয়া আশা করিতেও পারি না।

সময়ে সময়ে মানবমধ্যে অলোকসামান্য প্রতিভা ও বুদ্ধি-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহারা

পদার্থাদির ক্রিয়ার কিছু কিছু নিয়ম নির্ণয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু পদার্থাদি কেমন করিয়া হইয়াছে তাহা তাঁহারাও কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই। মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত ও অবধারিত করিয়া নিউটন গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি পদার্থের গতি প্রভৃতির নিয়ম লোকলোচনে ফুটাইয়া দিয়াছিলেন বটে। কিন্তু গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি পদার্থ কেমন করিয়া হইয়াছে, কি জন্য হইয়াছে, এ সকল তিনিও বুঝেন নাই, সুতরাং বুঝাইতেও পারেন নাই! তিনি Nature বা প্রকৃতির দুই একটা নিয়ম দেখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতি দেখিতে পান নাই। তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা সত্ত্বেও Nature বা প্রকৃতি আজ 'যে তিমিরে সেই তিমিরে'; বোধ হয় অনন্তকাল 'যে তিমিরে সেই তিমিরে' থাকিয়া যাইবে। তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষেরা সময়ে সময়ে পদার্থাদির ক্রিয়ার দুই একটা নিয়ম নির্ণয় করেন, আর সেইজন্য যৎকিঞ্চিৎ আলোক পাইয়া আমরা অতি অল্পমাত্র দেখিতে পাই এবং অতি অল্পমাত্র কার্য্য করি। যেটুকু দেখিতে পাই তাহাও যেন পরিষ্কার দেখি না, যে কার্য্য টুকু করি তাহাতে যেন অতি অল্পই সিদ্ধিলাভ করি। বস্তুতঃ আমাদের আলোকের অতি শোচনীয় অভাব। কিরূপ বলি শুন। চৈত্রমাস, কৃষ্ণ পক্ষ, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, আকাশ ও পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত। ভাগীরথী-তীরে বসিয়া আছি। ভাগীরথী দেখিতে পাইতেছি না। কেবল ভাগীরথীবক্ষে অতি দূরে অনতিদূরে, নিকটে অতি নিকটে, এক 'একটি ক্ষুদ্র ক্ষীণ দীপালোক দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে কিছুই দেখিতে পাওয়া

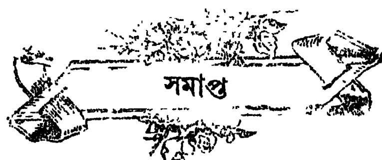
যাইতেছে না, কিছুই আলোকিত হইতেছে না, তাহা যেখানে সেইখানেই যেন স্তিমিতবৎ, তাহাতে দুঃখী মাঝিমাল্লা মোটা চালের মোটা ভাতও ভাল করিয়া দেখিয়া খাইতে পারে না। মনে হইল, ঐ আলোকটি আর্কিমিডিস, ঐ আলোকটি নিউটন, ঐ আলোকটি ডারউইন, ইত্যাদি ইত্যাদি—যেখানে জ্বলিতেছে সেইখানেই একটু ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোক, তাহাতে সেই ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোকটুকু মাত্র দেখা যায়, আর কিছুই দেখা যায় না। ফল কথা, আমরা জগতের কিছুই জানি না বলিলেই হয়। ইংলণ্ডের খ্যাতনামা বিজ্ঞানাচার্য্য লর্ড কেল্‌বিন্ ১৮৯৬ সালে তাঁহারই সম্বর্দ্ধনার্থ এক ভোজে বলিয়াছিলেন ;—

One word characterises the most streneous of the efforts for the advancement of science that I have made perseveringly for fifty five years—that word is failure. I know no more of electric or magnetic force, or of the relation between ether, electricity, and ponderable matter, or of chemical affinity, than I know and tried to teach to my students of Natural Philosophy fifty years ago in my first session as Professor."

ইহার মর্ম্মার্থ—পঞ্চান্ন বৎসর ধরিয়া বিজ্ঞানের উন্নতির নিমিত্ত আমি যে নিরবচ্ছিন্ন ও ঐকান্তিক উত্তম করিয়াছি, এক কথায় তাহার বিশেষত্বের উল্লেখ করিতে হইলে বলিতে হয়, ব্যর্থতাই

সে চেষ্টার পরিচায়ক লক্ষণ। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে প্রথম যখন আমি অধ্যাপকরূপে আমার ছাত্রগণকে শিক্ষা প্রদান করি তখন আমি প্রাকৃতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা জানিতাম, এই পঞ্চাশ বৎসর আলোচনার পর এখন যে তদপেক্ষা কিছু অধিক জানিয়াছি তাহা নহে।

বাস্তবিক মানুষ জানে অতি অল্প—জানিতে পারে অতি অল্প। তাই লর্ড কেল্‌বিন্ এত নম্র, এত বিনীত, এত নিরহঙ্কার। বিশ্বনাথের বিশ্বের কারণ-রহস্য এবং বস্তু-রহস্যের বিশালতা ও দুর্জ্ঞেয়তার কথা ভাবিলে সকলেরই লর্ড কেল্‌বিনের ন্যায় নিরহঙ্কার, নম্র ও বিনীত হওয়া কর্ত্তব্য।



প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস।
মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্।
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

OPINIONS ON CHANDRAKONA.

1. The Hon'ble Rai P. N. Mukherjee Bahadur M. A. I. S. O., Inspector General of Registration, Bengal :—

"I have read your well-conceived and well-written introduction to *Chandra-kona* with much interest and great pleasure The book is an anthology from the writings of your late revered father, whom I so much loved and respected and whose loss I still mourn. You both were ever devoted sons and in placing before the public a collection of the best pieces from his invaluable works you have not only performed a filial duty but conferred a boon on the reading public of .Bengal. There are so many pearls of wisdom scattered among the works of the great man who left his mark on his time, that it was a fortunate inspiration on your part to think of collecting them to-gether for the benefit of the ordinary readers whose time and inclination are limited."

2. Mahamahopadhyaya Dr. Satishchandra Vidyabhusan, M A., Ph. D, Principal Sanskrit College, Fellow and Syndic, Calcutta University :—

"*Chandrakona*—a Bengali text compiled from the writings of the renowned Bengali author late Babu Chandranath Basu M. A., B. L.,—is a work of great merit. The subjects treated in the work are instructive and useful and the style in which they have been couched, is chaste and idiomatic. It deserves a wide circulation."

3. Rai Sahib Dineshchandra Sen, B. A., (Head Examiner in Bengali. Matriculation Examination) Fellow of the Calcutta University :—

"*Chandrakona* is a collection of essays, written at various times by the late Babu Chandranath Basu. It

is not necessary to comment on the various points of excellence of Chandra Babu's writings. They are now the classics of our language. The selection comprises articles elucidating moral lessons, sketches of old village life, analytical reviews of some of our Pauranik legends and an interesting personal note on the great novelist Bankimchandra. Each of these articles indicates line which have been followed by a good number of Bengali writers. Sketches of village-life after the model supplied by our illustrious writer, have now become the fashion of the day. Pauranik legends, since the time when Chandra Babu illustrated their manifold excellences, have been taken up by a host of Bengali wrtters, whose contributions to this favoured topic are now numerous. The fine sketch of Bankimchandra, portrayed by his friend, has given a new tone to the biographical literature of our country. So we see that the pioneer's work is now complete, not only from the point of view of its literary value, but from the fact that the whole nation has taken up his line of work and followed his foot-steps. In spite of many imitators, however, the stamp of originality is obvious in his writings in their superior style and literary merits. I congratulate the brothers on their excellent choice in making the present collection and hope that it will command a wide circulation."

4. Prof, J. R. Banerjee M. A., B. L., Vice-principal Vidyasagar College, Fellow and Syndic Calcutta University :—

"*Chandrakona* (selections from the works of the famous man of letters, late Babu Chandranath Basu) is a book which I recommend to all readers of Bengali. Its style is excellent. The literary graces of Mr. Basu's

writings are well-known. The book ought to be largely used by school-boys and college-students for the acquisition of a knowledge of Bengali."

5. Sir Kailaschandra BoseKt, C, I. E, Rai Bahadur.

"The editor has spared no pains to make the little book—*Chandrakona*—which is a compilation from the works of his illustrious father the late Babu Chandranath Basu M A., B. L. most useful to the juvenile members of our community. I have gone through its pages and can confidently recommend the school authorities for its introduction into their classes.

6. Babu Satish Chandra Sen M. A., Head Master, Hindu School, Calcutta.

"I have read *Chandrakona* (selections from the writings of the late Babu Chandranath Basu) and am very glad to say that it will be an admirable text book for the higher classes of our schools."

7. Babu Harakanta Bose M. A., Head Master, Hare School, Calcutta.

"I have read with great pleasure portions of the book entitled *Chandrakona*, which is a collection of some of the finest essays of that master-writer in Bengali, the late Babu Chandranath Basu. The pieces have been judiciously selected and they are calculated to create in the reading public a love for Bengali literature. The compiler deserves well of the educational authorities, for placing before their students in a handy volume some of the noblest thoughts of his great father. The style of the illustrious writer possesses a unique charm and young aspirants after fame in the field of Bengali literature, would do well to imitate it."

8. Babu Jitendra Moban Sen B. Sc, Head Master, Keshab Academy, Calcutta.

"*Chandrakona* is an anthology from the writings of the well-known author late Babu Chandranath Basu. The selections are good and it will serve the purpose of an excellent guide in the matter of essay writing."

9. Babu Mohit Lal Mazumdar B. A., Asst. Head-master and Senior teacher of Bengali, Calcutta High School.

" *Chandrakona*—is a compilation of readings from the works of the late Babu Chandranath Bose, who is a name to conjure with in modern Bengali literature. I will not presume to discover any new graces in the style or diction of a writer who is one of that band of pioneers in Bengali prose, through whose brilliant efforts the language and literature of the land rose with a sudden long stride from a state of nascence to that of bold and vigorous adolescence. But the selections are so judicious and withal have such a matter-of-course air about them, that they serve to reflect no little credit on the part played by the editors, as also to surprise agreeably, that the works of an author of the late Babu Chandranath's range and calibre could furnish such easy and lucid specimens of composition—so eminently suited to the requirements of the young learners at school. I heartily congratulate the editors on the service they have done to current literature in general, and to the much-famished Bengali school-literature in particular. I hope they will follow up their publication with more in the same line, and if possible, with a higher literary plan and purpose."

10. S. K. Bhatterjee Esqr. Headmaster, L. M. S. Institution, Bhowanipore, Calcutta.

"I have glanced through *Chandrakona* and find it an excellent book both as regards style and subject matter."

11. Babu Nil Madhub Dutt B. A., Superintendent, Central Collegiate School, Calcutta.

" *Chandrakona*—an anthology from the works of the distinguished Bengali writer late Babu Chandranath Basu M. A., B. L.,—is an excellent book both for its literary merits and simple but elegant style. The four varieties of essays inserted in it will prove very instructive and useful to those for whom it is intended. It ought to be used by every student belonging to the higher classes of schools to have a command over Bengali language."

12. Babu Bhabataran Sarkar B. A., Headmaster, Srikrisna Pathsala, Calcutta.

"I had a hasty glance at *Chandrakona*. The book is a selection of articles from the pen of late Babu Chandranath Basu, M. A,, B. L., the illustrious writer of Bengali literature. It is a delightful reading from start to finis—from the rural scenes to the land of abstraction. The style and diction are unique and admirable, and need no further comment on their merit and excellence. The book will be very useful to the students of our schools and colleges for stocking their minds with new and rich thoughts and for writing good essays. The editors, the devoted sons of the writer, have shown great skill in their choice of subjects and I congratulate them on the eminent service they have rendered to the student community and the reading public. The book deserves a wide circulation."

13. Babu Tarak Chandra Chakraburty M. A., Head master Nabinagar High School, Dist. Tipperah.

" I have skimmed over the pages of *Chandrakona* and must congratulate you on your wise and judicious choice from the master-pieces of your father. I think I shall adopt your book for translation work and essay writing. The writings of

your father need no comment and they are books of permanent interest. The selections are wise and arrangement quite methodical and apt to the requirements of our school boys."

14. Babu Ashutosh Hati B. A., Headmaster Beldanga High School, Dist, Murshidabad.

"I have high veneration for your late father and his works. The book in question seems very useful and interesting to me"

15. Babu Satya Kumar Ghosal B. A., Headmaster Muragacha High School, Dist. Nadia.

"It is an excellent production from the pen of the famous author, late Babu Chandranath Basu, who needs no introduction. I think it will be highly useful to those for whom it is intended, and it is an excellent guide to essay-writing."

16. Moulavi Nabinoway Khan Lodi M. A., Headmaster, Sitakundu High School, Dist. Chittagong.

"It is a work of great merit"

17. Babu Shivadas Bhattacharya B. A., Headmaster anwaridabad High School, Dist. Murshidabad.

"It is a source of great pleasure to me to acknowledge receipt of a copy of *Chandrakona* (selections from the writings of the thoughtful Bengali author late Babu Chandrnaath Basu). I have all along been devoutly in favour of the matchless writings of your renowned father; selections from his works in a nicely got up volume are therefore, cordially welcome to me. The selections have been wisely done; and the volume would be highly beneficial and interesting both to the boys and the teachers. The Bengali reading public also will find much interest in it. I, for myself, shall be anxiously waiting for the publication of second 'Kona' from the boundless writings of your esteemed father."

18. Babu Panna Lal Bose B. A., Head master, Harinavi A. S. School Dist. 24 Parganas.

"It is an interesting collection of really masterpieces of the illustrious writer. It will be very much useful to the Matriculation students."

19. Babu Bhut Nath Das B. A., Head-master Joypur, Phakir Das Institution, Dist. Howrah.

"As to its need and utility, I am very glad to be able to say that this sort of books should be the crying need of the students for whom it is intended. The book, apart from its other good points, imparts a healthy moral tone which is quite adequate to enable it to recommend itself to the reading public. I shall see that my boys may read the book with profit and lively interest."

20. T. P. Mukherjee Esq. Head master, E. C. Institution, Jiaganj, Dist. Murshidabad.

"Touching the merits of the book both in regard to its manner and matter of treatment, I must confess that it will powerfully stand any amount of criticism."

21. Babu Makhan Lal Mazumdar M.A., Head master, Bel puker High School, Dist. Nadia.

"The book has given me much satisfaction"

22. Babu Tarak Nath Singha B. A., Headmaster, Gustia High School, Dist. 24 Parganas.

"It is an excellent work."

23. Babu Khagendra Mohan Sinha B. A., Headmaster, Domurhuda High School, Dist Nadia.

"I greatly rejoice at the appearance of such a compilation in the language. The work reflects gredit credit upon you.

24. Babu Khagendra Ch Mukherjee M. A., B. L., Head master, Farashganj High School, Dist Noakhali.

"I have gone through your book *Chandrakona* with great interest. Your collection of the best pieces from your illustrious father's works is certainly a distinct gain to our school boys. *Chandrakona* has filled up a long felt want."

25. Babu Upendra Nath Ghosh . A., Head master, South Garia B. Institution, Dist 24 Parganas.

"The book promises to be useful and instructive to those for whom it is intended."

26. R. Chakravarty Esq. Headmaster, Goalmath Union High School, Dist. Khulna.

"I was highly satisfied in going through your compilation —*Chandrakona.* The passages extracted are the best specimens of the renowned author and shall, no doubt, admirably suit the readers for whom they are intended. The book is a unique one as it is the first attempt in the Bengali literature to select passages from the writings of a single standard author and to compile them into a text-book."

27. Babu Amar Lal Chandra M. A. Headmaster, Gulhatia High School, Dfst. Murshidabad.

"I have much pleasure in stating that the book contains an admirable selection of some of the best extracts of an author who has already won fame and established a name in Bengali literature. The pieces are well adapted to stimulate the budding imagination of those for whom they are intended. The book will amuse and instruct them at the same time, besides furnishing ample food for their reflection in their after life."

28. Babu Haridas Bhattacharya M. A., Headmaster, Sagore Dutt Free High School, Kamarhati, Dist. 24 Parganas.

"I have gone through some of the pieces of your compilation and I am glad to say that they have been carefully collected and arranged so as to suit the taste and capacity of boys of high classess. I believe they will be interesting and instructive to the boys. I wish your book wide circulation."

29. Babu Mokshada K. Biswas M. A., Headmaster, J. M. Sen's Institute, Chittagong.

"The subject matter of the book has been very nicely and carefully selected and I hope, the book will be of great help to the students."

30. S. C. Ghose Esqr. Headmaster, Sarada Charan Institution, Udayanarayanpore, Dist. Howrah.

"I have gone through the work and can say with justice that the book speaks for itself."

31. Babu Mati Lal Kar B. A., Headmaster, Mdhudia High School, Dist. Khulna.

"I have very carefully gone through the book. It is indeed a bunch of beautiful flowers culled from the writings of the illustrious author late Babu Chandranath Basu M. A. B. L. so well-known in the field of Bengali literature. You have selected and nicely arranged some of the best essays from the masterly hand of the late author written in his characteristic simple and elegant style and in bringing out the book you have served to contribute a very valuable boon to the reading public. The students will not only enjoy the book but also profit by imitating and digesting its style and diction."

32. Babu Rajendra Nath Basu M. A., Headmaster, Diamond Harbour High School, Dist. 24 Perganas.

"I have read the book with pleasure and interest and I am quite sure a book of this type will be welcomed everywhere. It will give the students a peep into the writings of one of our greatest men of letters and at the same time it will enormously develop their faculty of thinking. The plain and elegant style of the book will recommend itself to the Bengali reading public. The subject matters, too, are very carefully selected."

33. Babu Bhimapada Ghose B. A., Headmaster, Kandi Raj High School, Dist. Murshidabad.

"I am very glad to go through *Chandrakona*. It is an excellent book."

34. Babn Aghore NathBanerjee M. A., Headmaster, Hooghly Collegiate School. Dist. Hooghly.

"I have the highest regard for the late Babu Chandranath Basu and a selection from his writings cannot but be a valuable reading book for boys."

35. Babu Surendra Ch. Chandra B. A, Headmaster, George Coronation High School, Raipur, Dist, Tippera.

"So far as I have seen of it, I can say the pieces are well selected and will prove useful and instructive to boys."

36. Babu Mahendra Nath Bhadra M. A., Headmaster, Suphalkati High School, Dist. Jessore.

"I have gone through *Chandrakona*, a compilation from the works of the great Bengali author late Babu Chandranath Basu M. A., B. L. The arrangement of subjects is quite right and the book will be of great use to those for whom it is intended. There are in it the productions of a thoughtful mind which will develop the thoughts of young boys and lead them to originality, without which education is no education."

37. Babu Annada Prosad Saraswati B.A., Headmaster, Dhoradaha High School, Dist. Nadia.

"It is an excellent collection from the writings of the well known educationist, the late Babu Chandranath Bose. The book will supply our long felt want of a Bengali text of rare merit. Among other things a tone of religious melody pervades the whole book. The style is excellent and the arrangement of subjects methodical. I am of opinion that the book ought to be largely used by our boys."

38. Babu Sasi Bhusan Bhattacharya M. A., Headmaster, Fukra Madan Mohan Academy, Dist. Faridpore.

"The perusal of the book from beginning to end has given me heavenly pleasure. I am really struck with the sonorous and elegant style, the simplicity as well as the sublimity of the

language throughout. The subjects treated are very instructive and useful and are very wisely selected. They will go a great way in enabling the students to write essays of all sorts with originality of thought."

39. Babu Birendra Bhusan Basu B. A., Headmaster, Jhenidah High School, Dist. Jessore.

"I have gone through your book *Chandrakona* an anthology from the writings or your late father Babu Chandranath Basu, and have found it a very pleasant reading, consisting as it does of selections of varied nature. I am sure the boys for whom it is intended will find the book very interesting and instructive.'

40. W. C. Dasgupta Esqr. Headmaster, Batisa High School, Dist. Tippera.

"The receipt of a book of the type of *Chandrakona* is a real pleasure to me, specially now a days when the text book world of Bengali has been invaded by hordes of hungry text-book writers. The book is unimpeachable from all points of view."

41. Babu Kisori Lal Sen B. A., Headmaster, Shambazar Vidyasagar School Calcutta.

"I have a great pleasure in acknowledging receipt of *Chandrakona* a collection of flowers from the writings of such a standard author as the late erudite Chandranath. It will prove a sure guide to the learners of Bengali composition. The variety of subjects treated in the valuable compilation displays features that strike the readers with their pervading moral tone, their rural aspects, their social hints, and their religious flashes. The chaste style which characterises the whole is truly remarkble."

42. Babu Suresh Chandra Nandi M. A., Headmaster, Town School, Calcutta.

"I have carefully gone through your excellent compilation *Chandrakona* which as the happy nomenclature suggests is an anthology from the classical writings of the late revered Babu Chandranath Basu. The portions selected seem to me to be suitable for the Matriculation classes of our schools, Instinct as these extracts are with the genuine feelings of a gifted scholar, a careful study and constant reading of these, while enabling the students to express themselves in a direct ,terse, pitby and natural style, will make them men in the true sense of the term."

Other works by the late Babu Chandra Nath Basu M. A. B. L. approved for use in High Schools.

Recommended by the authorities of the Calcutta University.

Name of Book.		Standard for which approved.
Sanjam Shiksha	... ...	For Matriculation Examination, 1920.

Approved by the Director of Public Instruction.

Sahitya Pustak Part IV.	...	For Standards III & IV of Vernacular Schools, corresponding to 7th and 6th Classes of High Schools.
Sahitya Pustak Part III.	...	For Standard II of Vernacular Schools corresponding to 8th Class of High Schools.
Sahitya Pustak Part II.	...	For Standard I of Vernacular Schools corresponding to 9th Class of High Schools.
Sahitya Pustak Part I.	...	For the Infant class.